এপ্রিল ২০২১ ■ বর্ষ ০২, সংখ্যা ০২

নদীবাংলা

প্রবহমান নদীর সাথে ◢ বিআইডব্লিউটিএ ত্রৈমাসিক প্রকাশনা

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

স্বাধীনতার ৫০ বছরে
বিআইডব্লিউটিএ'র অর্জন

ঢাকার চারপাশের নদী
বিবর্ণ তীরের নান্দনিক রূপান্তর

জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী
বঙ্গবন্ধুর বয়ানে নদী

পণ্য পরিবহনে নৌপথ উন্নয়নে
কাজ করছে সরকার: প্রধানমন্ত্রী

এপ্রিল ২০২১
বর্ষ ০২, সংখ্যা ০২

নদীবাংলা

বিআইডব্লিউটিএ'র নদী বিষয়ক
ত্রৈমাসিক প্রকাশনা

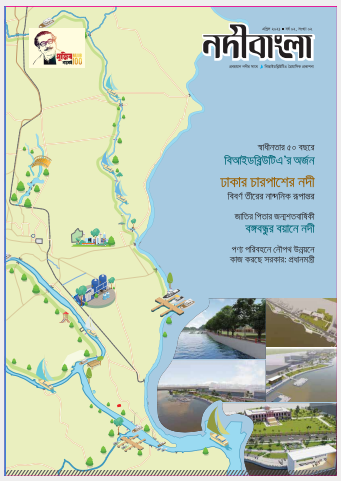

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
কমডোর গোলাম সাদেক, এনজিপি,
এনডিসি, এনসিসি, পিএসসি, বিএন

প্রধান সম্পাদক
ড. একেএম মতিউর রহমান
সদস্য (প্রকৌশল), বিআইডব্লিউটিএ

সম্পাদনা পর্ষদ
মো. আব্দুল আউয়াল
মুহাম্মদ আবু জাফর হাওলাদার
রকিবুল ইসলাম তালুকদার
মোহাম্মদ মিজানুর রহমান
মো. আব্দুল ওয়াকিল
রম্য রহিম চৌধুরী
তাজুল হক
জিনারুল ইসলাম

কনটেন্ট পরিকল্পনা, রচনা, পরিমার্জনা, ডিজাইন ও প্রকাশনা
ENLIGHTEN | VIBES

যোগাযোগ

জনসংযোগ শাখা
বিআইডব্লিউটিএ ভবন
১৪১-১৪৩ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
ফোন: ৯৫৫৬১৫১-৫৫, ফ্যাক্স: ৯৫৫১০৭২
ইমেইল: probiwta@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.biwta.gov.bd

এনলাইটেন ভাইবস
বাড়ি ৬, সড়ক ৩, সেক্টর ৫, উত্তরা
ঢাকা-১২৩০। ফোন: ০২-৪৮৯৫৬৭৪৮
ইমেইল: enlightenvibes@gmail.com

» সম্পাদকীয়

স্বাধীনতার পর বিআইডব্লিউটিএ'র পাঁচ দশকের পথচলায় ২০০৯ সাল পরবর্তী ছবিটা একেবারে ভিন্ন। সমন্বিত পরিকল্পনা ও কর্মোদ্যোগে জেগে উঠছে নদী ও নৌপথ।

বহু কাল আগে থেকেই অভ্যন্তরীণ নৌপথ এই অঞ্চলে যোগাযোগের প্রধানতম মাধ্যম। তবে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তা ছিল বেসরকারি খাতের নিয়ন্ত্রণে। নিয়ন্ত্রণকারী কোনো কর্তৃপক্ষ না থাকায় শৃঙ্খলার অভাব ছিল প্রকট। মুনাফাকে অতিমাত্রায় প্রাধান্য দিতে গিয়ে গৌণ হয়ে পড়ে যাত্রী ও পণ্য পরিবহন সেবার মানের বিষয়টি। বিভিন্ন সংস্থা ও বিশেষজ্ঞের দীর্ঘ সুপারিশের পর ১৯৫৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (ইপিআইডব্লিউটিএ) গঠিত হয় বটে, তবে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত ও দক্ষ জনবলের অভাবে প্রতিষ্ঠার প্রথম কয়েক বছরে অর্থনীতিতে বাড়তি তেমন কিছু যোগ করতে পারেনি খাতটি। পরিবহনের অন্যান্য মাধ্যমের মতো অতটা মনোযোগও পায়নি। স্বাধীনতার পর নতুন লক্ষ্যে, নতুন উদ্যোগে কাজ শুরু করে কর্তৃপক্ষ। এরপর পাঁচ দশকের পথ চলা। দীর্ঘ এই যাত্রায় কর্তৃপক্ষের কর্মে ও উদ্যোমে প্রচণ্ড গতি যেমন দেখা গেছে, সেই গতিতে ভাটাও পড়েছে কখনও-কখনও। তবে ২০০৯ সাল পরবর্তী ছবিটা একেবারে ভিন্ন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায়, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ও বিআইডব্লিউটিএ'র কর্মোদ্যোগে শুকিয়ে যাওয়া নৌপথ ফিরে পাচ্ছে নাব্যতা। পুরোনো নদীবন্দরের আধুনিকায়নের পাশাপাশি গড়ে উঠছে নতুন নতুন নদীবন্দর। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে এসে বিআইডব্লিউটিএ'র অর্জনের সেই খতিয়ানের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে "পাঁচ দশকে বিআইডব্লিউটিএ'র অর্জন" শীর্ষক বিশেষ রচনাটিতে।

উনিশ শতকেও পৌর প্রশাসনের নগর পরিকল্পনায় বুড়িগঙ্গার একটি স্থান ছিল। কারণ তখনো নদীর তীরকে বিনোদন কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হতো। তবে পাকিস্তান আমল থেকে নগর পরিকল্পনাবিদ ও নগর প্রশাসনের চিন্তায় বুড়িগঙ্গার আর স্থান হয়নি। তারপর বহু বছর কেটে গেছে। এর মধ্যেই বুড়িগঙ্গার গতিপ্রবাহে ভাটা পড়েছে। ঢাকা শহরের জনসংখ্যা বেড়েছে কয়েক গুন। ফলে বুড়িগঙ্গায় পয়ঃবর্জ্য নির্গমনের পরিমাণও বেড়েছে হু-হু করে। পাশাপাশি বেড়েছে বুড়িগঙ্গা দূষণকারী শিল্পবর্জ্যের নির্গমনও। দূষণের পাশাপাশি দখলেও একসময় শীর্ণকায় রূপ ধারণ করে ঢাকার এই প্রাণরেখা। আগ্রাসনের মুখে পড়তে হয় একদা স্বচ্ছ ও সুপেয় পানির নদী শীতলক্ষ্যাকে। মূলত নারায়ণগঞ্জ নদীবন্দর ঘিরেই চলে দখলের এই মচ্ছব। সময়ের পরিক্রমায় বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যার মতো তুরাগ ও বালু নদকেও জোর করে বেঁধে ফেলতে থাকে মানুষ। পর্যাপ্ত পানিপ্রবাহের অভাবে শুকিয়ে মরে যাওয়া নদীবক্ষে উঠতে থাকে বাড়িঘর, দোকান, কারখানা।

দখল-দূষণে ঢাকার চারপাশের নদীগুলো মরে যেতে বসলেও সেগুলোর প্রাণ ফেরাতে রাজনৈতিক অঙ্গীকার ও সমন্বিত পরিকল্পনার অনুপস্থিতি দেখা গেছে দীর্ঘদিন। দূষণ ও দখলমুক্তির কিছু কিছু উদ্যোগ মাঝেমধ্যে নেওয়া হলেও সেগুলো খুব বেশি যে ফলদায়ক হয়েছে, সেটা বলা যাবে না। তবে আশার কথা হলো বর্তমান সরকার ঢাকার চারপাশের নদীগুলোসহ দেশের সব নদী রক্ষায় অঙ্গীকারের কথা তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে স্থান দিয়েছে। সে অনুযায়ী নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ঢাকার চারপাশের নদীগুলোর প্রাণ ফেরাতে কাজ করছে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)। নাব্যতা বৃদ্ধিসহ স্থায়ী সীমানা পিলার স্থাপন, ওয়াকওয়ে নির্মাণ এবং ইকোপার্ক ও বনায়ন কর্মসূচির দৃশ্যমান অগ্রগতিও চোখে পড়ছে। দৃশ্যমান অগ্রগতি হলেই শুধু হবে না, একে টেকসই রূপও দিতে হবে। 'নদীবাংলা'র এই সংখ্যায় বক্ষমাণ প্রধান রচনাটি সেটা নিয়েই।

অন্যসব খাতের মতো অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন খাতেও এখন ডিজিটালাইজেশনের ছোঁয়া। সেই আলোচনাও থাকছে এবারের সংখ্যায়। আছে নদী ও নৌপথ নিয়ে সরকারের আরও পরিকল্পনার সারকথা। নিয়মিত আয়োজন হিসেবে নাতিদীর্ঘ কলেবরে এবারও তুলে এনেছি আমাদের নদী ও আমাদের বন্দরের কথা। পরিভ্রণ করেছি দূর অতীতে, আমাদের ঐতিহ্যে। সেই সাথে থাকছে দেশ-বিদেশের নদী ও নৌ-খাত নিয়ে সবশেষ ঘটনাপ্রবাহের কথা ও ছবি।

প্রিয় পাঠক, আশা করি আমাদের এই প্রয়াস নদী ও নৌপথ নিয়ে আপনার জিজ্ঞাসার উত্তর দেবে। কিছুটা হলেও নতুন ভাবনার খোরাক জোগাবে। আপনার মূল্যবান মতামত, মন্তব্যসমৃদ্ধ কলেবরে 'নদীবাংলা'র পথচলা এগিয়ে নেবে।

প্রধান রচনা

বিবর্ণ তীরের নান্দনিক রূপান্তর

নদীবাংলা এ সংখ্যায় থাকছে

বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, বালু বা শীতলক্ষ্যা–সবখানেই দূষণের বিষবাষ্প আর দখলের ক্ষতচিহ্ন। তীর দখল করে কোথাও ইট-সিমেন্টের দালান তো কোথাও শিল্পের বর্জ্যে বিষিয়ে ওঠা পানি। ঢাকার চারপাশের নদ-নদীর বহুদিনের এই চেনা রূপেই আসছে আমূল পরিবর্তন। তীরভূমি মুক্ত করে তা ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে নদীর কাছে। দখলমুক্ত নদী আবার যাতে বন্দি না হয়, সেজন্য সীমানা চিহ্নিত করে বসছে স্থায়ী পিলার। নদীতীরে নির্মিত হচ্ছে ওয়াকওয়ে। ইকোপার্ক, বনায়নের কর্মযজ্ঞও চলছে জোরেশোরে।

সম্পাদকীয় ০২

নদী-নৌপথের সংবাদ ২৩
- বাংলাদেশ-ভারত পানিসম্পদ-সংক্রান্ত সহযোগিতা বৃদ্ধিতে জোর
- হালদা নদীকে 'বঙ্গবন্ধু জীববৈচিত্র্য-সমৃদ্ধ ঐতিহ্য হালদা' ঘোষণা
- 'দ্বীপবন্ধু মুস্তাফিজুর রহমান জেটি' উদ্বোধন
- পণ্য পরিবহনে নৌপথ উন্নয়নে কাজ করছে সরকার: প্রধানমন্ত্রী
- শীতলক্ষ্যা তীরের অবৈধ স্থাপনা অপসারণ চলবে: নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী
- 'জাহাজ নির্মাণ শিল্পে বাংলাদেশের সম্ভাবনা বিপুল'
- বাংলাদেশ থেকে নৌপথে ভারতে গেল খাদ্যপণ্যের প্রথম চালান
- বরিশাল বিভাগের ৩১টি নৌপথের নাব্যতা বাড়ানো হচ্ছে
- সিলেটে নদী রক্ষায় ১০ দফা দাবি
- আরিচা-কাজিরহাট ফেরি সার্ভিস চালু
- অভিন্ন ৬ নদীর পানিবণ্টনে রাজ্যগুলোর সম্পৃক্ততা চায় বাংলাদেশ
- রূপনগর খাল তুরাগের সাথে সংযুক্ত হবে
- পদ্মায় চালু হলো 'পদ্মা ক্রুজ'
- উত্তরবঙ্গের নদীগুলোর খনন দ্রুত শেষ করার সুপারিশ
- ধরলা নদীর তীর সংরক্ষণ কাজ উদ্বোধন
- জেআরসির বৈঠকে ফলপ্রসূ আলোচনা
- ডিএনসিসির ১৩ খাল পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা'
- 'শরীয়তপুরে নদীভাঙন রোধে দ্রুত কাজ করছে সরকার'
- বুড়িগঙ্গার আদি চ্যানেলের ৭৪ স্থাপনা উচ্ছেদের নির্দেশ হাইকোর্টের
- বাংলাদেশের বিশেষজ্ঞদের রামনগর নদীবন্দর পরিদর্শন

আমাদের নদী ২০
- তুরাগ: টঙ্গীর আশীর্বাদ

সংবাদ সংক্ষেপ ২৭
- এনআরসিসির নতুন চেয়ারম্যান আলী কবীর
- বিআইডব্লিউটিএতে এপিএ শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স
- বিআইডব্লিউটিএ'র গণসংগীত ও নৌর‍্যালি আয়োজন
- হালদায় বালু উত্তোলনকারী ১৫টি নৌকা জব্দ
- ঢাকার নদী দূষণরোধে নতুন পয়োশোধনাগার
- পাবনায় ইছামতীর পুনঃখনন শুরু
- অবৈধভাবে বালু উত্তোলনকারী ১৫ ড্রেজার ধ্বংস
- সিরাজগঞ্জে নদী খনন শুরু
- সিসিটিভির আওতায় হালদা নদী
- ৪০০ টন কয়লা নিয়ে পশুর নদীতে কার্গোডুবি
- নৌযান চলাচল নির্বিঘ্ন করতে পুনর্নির্মাণ হবে ১৩ সেতু
- গোমতী থেকে অবৈধ ড্রেজার ও পাইপ জব্দ
- মধুমতীর ১২০ একর তীরভূমি উদ্ধার
- দুটি ড্রেজার পাঠিয়েছে এলিকট ড্রেজেস

ছবিতে বিআইডব্লিউটিএ ২৫
- জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে বিআইডব্লিউটিএ'র পুষ্পস্তবক অর্পণ
- বিআইডব্লিউটিএ চেয়ারম্যানের বরিশাল নদীবন্দর পরিদর্শন
- বিআইডব্লিউটিএ চেয়ারম্যান ও ডিএসসিসি মেয়র বৈঠক
- বিআইডব্লিউটিএ'র শর্টকোড ১৬১১৩ উদ্বোধন
- ৭ মার্চ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ
- বিআইডব্লিউটিএ ভবনে জাতির পিতার ভাস্কর্য উন্মোচন
- পাবনায় নবনির্মিত মেরিন একাডেমি পরিদর্শনে নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী

আমাদের বন্দর ২১
- টঙ্গী নদীবন্দর: গেজেটভুক্ত প্রথম প্রজন্মের বন্দর

ঐতিহ্য ৩৫
- কিল্লা আওরঙ্গবাদ: বুড়িগঙ্গাকে আশ্রয় করে প্রাসাদ দুর্গ

প্রযুক্তি ২২
- অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন খাতে ডিজিটালাইজেশনের ছোঁয়া

আন্তর্জাতিক সংবাদ ৩১
- ২০৩০ নাগাদ ২৩টি নৌপথ চালু করতে চায় ভারত
- ম্যাগপাই নদী এখন জীবন্ত সত্তা
- ৩১০ কিলোমিটার দীর্ঘ ভেলি-ছাবাকাড় নৌপথ চালু
- চার দশক পর ইলিশ যাচ্ছে গঙ্গার উজানে
- আসছে হাইড্রোজেনচালিত অভ্যন্তরীণ নৌযান
- ৪ হাজার কিমি অভ্যন্তরীণ নৌপথ উন্নয়ন করছে ভারত
- পশ্চিমবঙ্গের নৌপথ উন্নয়নে বিশ্বব্যাংকের ঋণসহায়তা
- যুক্তরাষ্ট্রের নৌপথ ও বন্দর অবকাঠামো উন্নয়নে বড় বিনিয়োগ
- সর্ববৃহৎ অভ্যন্তরীণ নৌযান নামাল চীন
- উপকূলীয় নৌযান চলাচলে এসসিআই ও আইডব্লিউএআই চুক্তি
- এলপিজি পরিবহনে এমওএলের সাথে আইডব্লিউএআইয়ের চুক্তি
- জলবায়ু পরিবর্তন দীর্ঘমেয়াদে নদীর প্রবাহ বদলে দিচ্ছে
- ভারতে প্রথম নদী সংযুক্তিকরণ চুক্তি
- ব্যর্থ হওয়ার পথে বারানসি-কলকাতা নৌ-চলাচল

০৪

» বিশেষ রচনা

বঙ্গবন্ধুর বয়ানে নদী

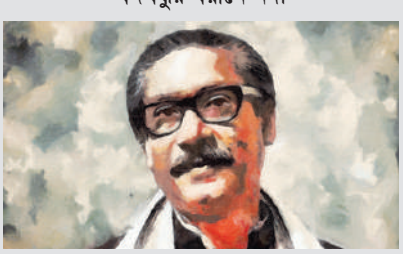

গোপালগঞ্জ তখন ফরিদপুর জেলার একটি মহকুমা। টুঙ্গিপাড়া এই মহকুমারই ছবির মতো একটি গ্রাম। মধুমতীর শাখা বাইগার নদী এই টুঙ্গিপাড়াকে সে ছুঁয়ে গেছে পরম মমতায়। নদীতে তখন পাল উড়ানো অগুনতি নৌকার যাতায়াত। বৈঠা হাতে মাঝির কণ্ঠে ভাটিয়ালি গান। তাল, তমাল আর হিজলে বোনা ঘন অরণ্যে পাখির কলরব। গাছের ছায়ায়, নদীর কলতানে ভরা স্নিগ্ধ পরিবেশের এই টুঙ্গিপাড়াতেই আবির্ভাব জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের। ১৯২১ সালের ১৭ মার্চ। এ বছর তার শততম বার্ষিকী।

২৩

» নদী-নৌপথের সংবাদ

পানিসম্পদ-সংক্রান্ত সহযোগিতা বৃদ্ধিতে জোর

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বৈঠকে পানিসম্পদ-সংক্রান্ত সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। তিস্তা নদীর পাণ্ডিবন্টন দীর্ঘদিনের বকেয়া অন্তর্বর্তী চুক্তিটি শিগগিরই সম্পাদনের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আবারও উদ্যোগ গ্রহণে ভারতের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন। নরেন্দ্র মোদিও এই চুক্তি বাস্তবায়নের ব্যাপারে ভারতের অঙ্গীকারের কথা পুনর্ব্যক্ত করেছেন। এছাড়া মনু, মুহুরি, খোয়াই, গোমতী, ধরলা এবং দুধকুমারের পানিবণ্টনের আলোচনা দ্রুত শেষ করতে নির্দেশ দিয়েছেন উভয় নেতা।

১২

» বিশেষ রচনা

স্বাধীনতার ৫০ বছরে বিআইডব্লিউটিএ'র অর্জন

যোগাযোগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হওয়ার পরও স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী দশকের পর দশক ধরে অবহেলিত থেকেছে এই অঞ্চলের অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন ব্যবস্থা। পরিবহনের অন্যান্য মাধ্যম যেমন সড়ক, রেল ও আকাশপথে সরকারের নিয়ন্ত্রণ থাকলেও ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন খাত ছিল ঠিক এর বিপরীত। বিভিন্ন সংস্থা, বিশেষজ্ঞের দীর্ঘ সুপারিশের পর ১৯৫৮ সালের নভেম্বরে অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ গঠন করে সরকার। এরপর দেড়শর বেশি প্রকল্প সম্পন্ন করেছে সংস্থাটি। ১৩০টির বেশি সম্পন্ন করেছে স্বাধীনতা-পরবর্তী পাঁচ দশকে।

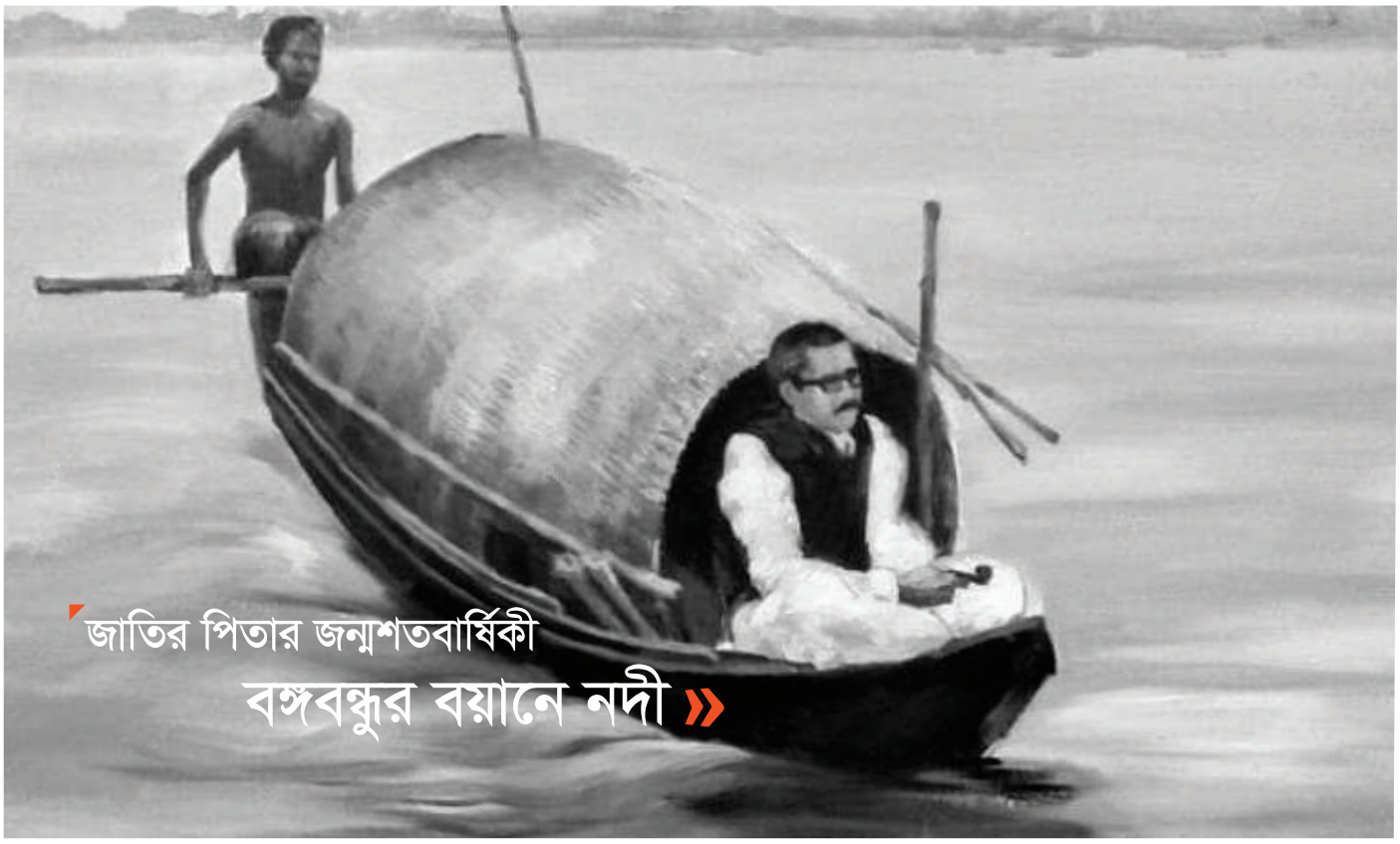

জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী

বঙ্গবন্ধুর বয়ানে নদী »

জন্ম টুঙ্গিপাড়ায়; বাইগার নদী ছুঁয়ে যাওয়া ছবির মতো গ্রামে। শৈশবে নদীর বুকে পাল উড়ানো নৌকা দেখা, মাঝির কণ্ঠে ভাটিয়ালি গান শোনা। তাল, তমাল আর হিজল বনে পাখির ডাকে মুগ্ধ হওয়া। নদীর প্রবহমানতা ও বিশালতাকে ধারণ করে নদীর মতোই মহানুভব এক মানুষ হয়ে ওঠা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৭ মার্চ ছিল তার শততম জন্মবার্ষিকী।

গোপালগঞ্জ তখন ফরিদপুর জেলার একটি মহকুমা। টুঙ্গিপাড়া এই মহকুমারই ছবির মতো একটি গ্রাম। মধুমতীর শাখা বাইগার নদী এই টুঙ্গিপাড়াকে সে ছুঁয়ে গেছে পরম মমতায়। নদীতে তখন পাল উড়ানো অগুনতি নৌকার যাতায়াত। বৈঠা হাতে মাঝির কণ্ঠে ভাটিয়ালি গান। তাল, তমাল আর হিজলে বোনা ঘন অরণ্যে পাখির কলরব। গাছের ছায়ায়, নদীর কলতানে ভরা স্নিগ্ধ পরিবেশের এই টুঙ্গিপাড়াতেই আবির্ভাব জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের। ১৯২১ সালের ১৭ মার্চ।

বঙ্গবন্ধু তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে জন্মস্থানের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে–'আমার জন্ম হয় ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে। আমার ইউনিয়ন হলো ফরিদপুর জেলার দক্ষিণ অঞ্চলের সর্বশেষ ইউনিয়ন। এই ইউনিয়নের পাশেই মধুমতী নদী। মধুমতী খুলনা ও ফরিদপুর জেলাকে ভাগ করে রেখেছে।' (অসমাপ্ত আত্মজীবনী: পৃষ্ঠা ১)

শেখ বংশে জন্ম নেওয়া বঙ্গবন্ধুর শৈশব কেটেছে এই টুঙ্গিপাড়াতেই, নদীর পানিতে ঝাঁপ দিয়ে, মেঠোপথের ধুলোবালি মেখে, বর্ষার কাদাপানিতে ভিজে। শেখ বোরহানউদ্দিন নামে এক ধার্মিক পুরুষ মধুমতীর তীরেই এই শেখ বংশের গোড়াপত্তন করেছিলেন।

বঙ্গবন্ধু তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে সে সম্পর্কে লিখেছেন–'শেখ বোরহানউদ্দিন কোথা থেকে কিভাবে এই মধুমতীর তীরে এসে বসবাস করেছিলেন কেউই তা বলতে পারে না। আমাদের বাড়ির দালানগুলোর বয়স দুইশ বছরের বেশি হবে। শেখ বোরহানউদ্দিনের পরে তিন-চার পুরুষের কোনো ইতিহাস পাওয়া যায় না। তবে শেখ বোরহানউদ্দিনের ছেলের ছেলে অথবা দুই/এক পুরুষ পরে দুই ভাইয়ের ইতিহাস পাওয়া যায়। এঁদের সম্পর্কে অনেক গল্প আজও শোনা যায়। এক ভাইয়ের নাম শেখ কুদরতউল্লাহ, আর এক ভাইয়ের নাম শেখ একরামউল্লাহ। আমরা এখন যারা আছি তারা এই দুই ভাইয়ের বংশধর। এই দুই ভাইয়ের সময়েও শেখ বংশ যথেষ্ট অর্থ ও সম্পদের অধিকারী ছিল। জমিদারির সাথে সাথে তাদের বিরাট ব্যবসাও ছিল।' (অসমাপ্ত আত্মজীবনী: পৃষ্ঠা ৩)।

সেকালে শেখদের এই যে বিরাট ব্যবসা ও ঐশ্বর্য সেখানেও নদী-নৌকাই আশীর্বাদ। বঙ্গবন্ধুর বয়ানে–'শেখদের নৌকার বহর ছিল। সেই সব নৌকা মাল নিয়ে কলকাতায় যেত।' (অসমাপ্ত আত্মজীবনী: পৃষ্ঠা ৩)।

বাইগার-মধুমতীর জল-হাওয়ায় বড় হতে হতে নদীর যান নৌকার সাথে বঙ্গবন্ধুর নিবিড় এক সম্পর্কও তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তার নিদর্শন আমরা দেখতে পাই ১৯৫২ সালে তাঁর চীন ভ্রমণের অভিজ্ঞতায়। সেখানে বঙ্গবন্ধু তাঁর নৌকা ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথা বয়ান করেছেন এভাবে–'তাড়াতাড়ি খেয়ে নৌকায় উঠলাম। ছোট্ট ছোট্ট নৌকা, দু'জনে বৈঠা বায় দাঁড় টানার মতো করে। মেয়েরাই নৌকা চালায় এদেশে।' 'আমার দেখা নয়াচীন: পৃষ্ঠা ৮০)।

নৌকাগুলোর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, "আমাদের জন্য চারখানা নৌকা ঠিক হলো। নৌকার ভিতরে চারজন করে বসতে পারে। মোটরগাড়ির মতো গদি দেওয়া বসবার জায়গা। আমাদের সাথে চা, ফল-ফলাদি কিছু নেওয়া হয়েছিল। নৌকা ছাড়া হলো। আমাদের মধ্যে অনেকে নৌকা বাইবার জন্য ব্যস্ত হয়ে গেল। অনেকে চেষ্টা করলো দাঁড় টানতে, হাল ধরতে, কেউই ঠিকমতো নৌকা বাইতে পারে না। শেষ পর্যন্ত আমি বললাম, তোমরা বালুর দেশের লোক, নৌকা বাইবা কী করে? ঘোড়া দাবড়াতে পারো।" (আমার দেখা নয়াচীন: পৃষ্ঠা ৮০)।

পানির দেশের মানুষ বঙ্গবন্ধু এরপর নিজেই দাঁড়ে হাত লাগিয়েছিলেন–'আমার নৌকায় সামনের যে দাঁড় ছিল, প্রথমে আমি দাঁড়টা টানতে শুরু করলাম। কার নৌকা আগে যায় দেখা যাবে! কেউই পারে না, কারণ আমি

» আমি পাকা মাঝি, বড় বড় নৌকার হাল আমি ধরতে পারি। দাঁড় টানতে, লগি মারতে সবই পারি।

পাকা মাঝি, বড় বড় নৌকার হাল আমি ধরতে পারি। দাঁড় টানতে, লগি মারতে সবই পারি। পরে আবার হাল ধরলাম। পাকা হালিয়া–যারা আমাদের নৌকার মাঝি তারা তো দেখে অবাক! এ আবার কোন দেশের লোক! এক মাঝি জিজ্ঞাসা করলো, আপনাদের বাড়ি কোন দেশে? দোভাষী সাথে ছিল, বললাম, পূর্ব পাকিস্তান। মুখের দিকে চেয়ে রইলো। মনে হলো কোনোদিন নামও বোধ হয় শোনে নাই, তাকে বুঝাইয়া বললাম, তারপর সে বুঝলো। তাকে বললাম, আমাদের পানির দেশ, বৎসরে ৬ মাস আমরা পানির মধ্যে থাকি।' (আমার দেখা নয়াচীন: পৃষ্ঠা ৮০)।

নদী নিজে সুন্দর, সুন্দরের নির্মাতা; তা সে এই বাংলার পদ্মা-মেঘনা হোক বা সুদুর চীন দেশের কোনো অঞ্চলকে ঋদ্ধ করে ছুটে চলা নদীই হোক। সব নদীর মধ্যেই ধ্বনি-ছন্দে, তালে-মাত্রায় কোথায় যেন একটা মিল আছে। তাই তো সাংহাই শহরের পাশ দিয়ে বয়ে চলা নদীটিও বঙ্গবন্ধুর চোখে ধরা দিয়েছে সমান সৌন্দর্য ও গুরুত্ব নিয়ে–'এক ঘণ্টা পরে আবার বেরিয়ে পড়লাম সাংহাই শহরের পাশে যে নদী বয়ে গেছে তা দেখবার জন্য। আমাদের দেশের মতোই নৌকা, লঞ্চ চলছে এদিক ওদিক। নৌকা বাদাম দিয়ে চলে।' (আমার দেখা নয়াচীন: পৃষ্ঠা ৭৬)।

আর এই বাংলার নদ-নদীর ঢেউয়ের ভাষাও যেন বুঝতে পারতেন জাতির পিতা। নদীর বুকে ভাটিয়ালি গানের সুর ঢেউয়ের সাথে মিলেমিশে যে অদ্ভুত এক অনুরণন তোলে, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার কৃষ্ণনগরে নৌযাত্রার সময় তা খুব করে অনুভব করেছিলেন তিনি। সেই বর্ণনা ধরা আছে অসমাপ্ত আত্মজীবনীর পাতায়। কৃষ্ণনগর হাইস্কুলের দ্বারোদ্ঘাটন অনুষ্ঠান শেষে নৌকায় করে ফিরছিলেন বঙ্গবন্ধু। সাথে ছিলেন বিখ্যাত গায়ক আব্বাসউদ্দিন আহমেদ। জাতির পিতার বয়ানে–'পরের দিন নৌকায় আমরা রওয়ানা করলাম, আশুগঞ্জ স্টেশনে ট্রেন ধরতে। পথে পথে গান চলল। নদীতে বসে আব্বাসউদ্দিন সাহেবের ভাটিয়ালি গান তার নিজের গলায় না শুনলে জীবনের একটা দিক অপূর্ণ থেকে যেত। তিনি যখন আস্তে আস্তে গাইতেছিলেন, তখন মনে হচ্ছিল নদীর ঢেউগুলোও যেন তার গান শুনছে।' (অসমাপ্ত আত্মজীবনী: পৃষ্ঠা ১১১)।

বঙ্গবন্ধুর মানস গঠনে নদীর ভূমিকা অপরিসীম। নদীর বহমানতা ও বিশালতা নিজের মধ্যে ধারণ করে তিনি নিজেও হয়েছিলেন মহানুভব এক মানুষ। বাংলার মানুষকে তিনি ভালোবেসেছিলেন নদীর মতোই। নদীপাড়ের মানুষগুলোও তাকের স্থান দিয়েছিলেন হৃদয়ের খুব গভীরে। নদীর বুকে ডাকাতি যার পেশা, তার কাছেও তিনি ছিলেন পরম শ্রদ্ধেয়, পূজনীয়। সেই নিদর্শন আমরা দেখতে পাই কোনো এক রাতে তার মধুমতী পাড়ি দেওয়ার সময়।

'আমরা দুইজন রাত দশটায় একটা এক মাঝির নৌকায় রওয়ানা করলাম। নৌকা ছোট্ট, একজন মাঝি। মধুমতী দিয়ে রওয়ানা করলাম। কারণ, তাঁর (মাওলানা শামসুল হক) বাড়ি মধুমতীর পাড়ে। মধুমতীর একদিকে ফরিদপুর, অন্যদিকে যশোর ও খুলনা জেলা। নদীটি এক জায়গায় খুব চওড়া। মাঝে মাঝে, সেই জায়গায় ডাকাতি হয়, আমাদের জানা ছিল। ঠিক যখন আমাদের নৌকা সেই জায়গায় এসে হাজির হয়েছিল, আমি তখন ক্লান্ত ছিলাম বলে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। পানির দেশের মানুষ নৌকায় ঘুমাতে কোনো কষ্ট হয় না। কাজী সাহেব তখনও ঘুমান নাই। এই সময় একটা ছিপ নৌকা আমাদের নৌকার কাছে এসে হাজির হল। চারজন লোক নৌকার মাঝিকে জিজ্ঞাসা করল, আগুন আছে কি না? আগুন চেয়েই এই ডাকাতরা নৌকার কাছে আসে, এই তাদের পন্থা। আমাদের নৌকার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, "নৌকা যাবে কোথায়?" মাঝি বলল, টুঙ্গিপাড়া, আমার গ্রামের নাম। নৌকায় কে? মাঝি আমার নাম বলল। ডাকাতরা মাঝিকে বৈঠা দিয়ে ভীষণভাবে একটা আঘাত করে বলল, "শালা আগে বলতে পার নাই শেখ সাহেব নৌকায়।" এই কথা বলে নৌকা ছেড়ে দিয়ে তারা চলে গেল।' (অসমাপ্ত আত্মজীবনী: পৃষ্ঠা ১২৫)।

নদী যেমন সৃষ্টি, একই সাথে সে স্রষ্টাও। এর গতিতে যেমন গড়ার মন্ত্র, তেমনি থাকে ধ্বংসের বীজও। তাকে জেনে-বুঝে বশে আনতে পারলেই সে হয়ে ওঠে সমৃদ্ধির আকর। চীন সফরে গিয়ে চীনের দুঃখ হোয়াংহো নদীকেও এই রূপেই দেখেছিলেন বঙ্গবন্ধু। বাঁধ দিয়ে হোয়াংহোকে কীভাবে চীনারা কৃষি উৎপাদনে কাজে লাগিয়েছিলেন গভীরভাবে তা উপলব্ধি করেছিলেন। প্রত্যক্ষ করেছিলেন নদী-খাল সংস্কারের সুফলও। সেই অভিজ্ঞতা জাতির পিতা বিবৃত করেছেন তার চীন সফরের স্মৃতিকথায়।

'সরকার জনগণের সাহায্য নিয়ে হাজামজা নদী, খাল কাটতে শুরু করেছে। প্রত্যেক বৎসর বন্যায় লক্ষ একর জমির ফসল পূর্বে নষ্ট হয়ে যেত; আজ আর সাধারণ বর্ষায় ফসল নষ্ট হতে পারে না। একমাত্র হোয়াংহো নদীতে বন্যায় বৎসরে লক্ষ লক্ষ একর ফসল নষ্ট হতো। সরকার হোয়াংহো নদীতে বাঁধ বাধবে বলে জনগণেকে ডাক দিলো। লক্ষ লক্ষ লোক পেটে খেয়ে সরকারকে সাহায্য করলো। হোয়াংহোকে বলা হয় চীনের দুঃখ। চীনারা আগে কোনোদিন এই বাঁধ বেধে রাখতে পারে নাই। কিন্তু বিপ্লবের পর দেশপ্রেম ও জাতীয় সংহতির দৃঢ়তায় চীনারা অসাধ্য সাধন করেছে। এখন আর হোয়াংহো নদীতে বন্যা হতে পারে না। লোকের এখন আর চিন্তা করতে হয় না। আরামে বৎসরের পর তাদের পরিশ্রমের ফল তারা পায়।' (আমার দেখা নয়াচীন: পৃষ্ঠা ৯১)।

এই সব অভিজ্ঞতা পরবর্তীতে রাষ্ট্রনায়ক বঙ্গবন্ধুর নদীকেন্দ্রিক রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল। নদী নিয়ে তাঁর ভাবনা, পরিকল্পনা ও উদ্যোগের মধ্যে আমরা এর প্রতিফলন দেখতে পাই। তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও উদ্যোগেই আমাদের নদী ও নৌপথ সমৃদ্ধ, বেগমান এবং পরিবেশবান্ধব হয়।

নদীর প্রবহমানতাকে সঙ্গী করে, নদীর বিশালত্বকে আধেয় করে জীবন কাটানো জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মের এবার শততম বর্ষ। একই সাথে স্বাধীনতারও সুবর্ণজয়ন্তী। বাঙালি জাতির এ মহান নেতার জন্মশতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে তাঁকে স্মরণে কমতি রাখা হয়নি। নদী ও নৌপথে বঙ্গবন্ধুর অবদান স্মরণ করে নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে বিশেষভাবে দিবসটি পালন করে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষও (বিআইডব্লিউটিএ)।

বঙ্গবন্ধুকে স্মরণে মতিঝিলে বিআইডব্লিউটিএ ভবনে জাতির পিতার ভাস্কর্য স্থাপন করা হয়েছে। ২৬ মার্চ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর দিনে নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী ভাস্কর্যটি উদ্বোধন করেন। পরে বিআইডব্লিউটিএ ভবনে 'বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্রচিন্তা, সাফল্য ও সাম্প্রতিক অর্জন' শীর্ষক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'বঙ্গবন্ধু আমাদের হৃদয়ে আছেন এবং থাকবেন। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের ১৬ কোটি মানুষের হৃদয়ে আছেন। বঙ্গবন্ধুকে আমরা হৃদয়ের মধ্যে ধারণ করেছি। বঙ্গবন্ধু আমাদের গর্বের এবং অহংকারের বিষয়। মুক্তিযুদ্ধ, বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু এক ও অভিন্ন।'

তাঁর কথায়, 'বঙ্গবন্ধুকে নিয়েই আমাদের চলতে হবে। বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধকে ধারণ করেছে বলেই বাংলাদেশ আজ আলোকবর্তিকা হিসেবে সমগ্র পৃথিবীতে জ্বলজ্বল করে জ্বলছে।'

নৌকায় চড়ে বঙ্গবন্ধুর নদী পাড়ি দেওয়ার স্মৃতি অসংখ্য। ১৯৫৪ সালে রাজশাহীতে যুক্তফ্রন্টের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নিতে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে নৌকায় চেপে নদী পার হন জাতির পিতা ■ *ছবি: বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর*

ঢাকার চারপাশের নদী
বিবর্ণ তীরের নান্দনিক রূপান্তর »

নদীবাংলা ডেস্ক

এক দিকে অগুনতি শিল্প থেকে নির্গত বিষবর্জ্য। অন্যদিকে নদীর পাড় দখল করে অসংখ্য অবৈধ নির্মাণ। এসবের সম্মিলিত আঘাতেই শীর্ণ নদী আরও বিশীর্ণ। ঢাকার চারপাশের নদীগুলোর ছবিটা ছিল এমনই। সেই ছবিতেই এখন বদলের ধারা। সুসংহত পরিকল্পনায়, উদ্যমী কর্মে। নদী রক্ষায় দৃশ্যমান স্থায়ী সীমানা পিলার; পাড় ধরে ওয়াকওয়ে, পার্ক।

প্রাক-কথা

গঙ্গা পরিভ্রমণের পরিক্রমায় দূর ভবিষ্যতের নদীর রূপ দেখতে পেয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। কণ্ঠ ভারী করে একদিন বলেছিলেন, 'এই বেলা এই গঙ্গা-মার শোভা যা দেখবার দেখে নাও, আর বড় একটা কিছু থাকছে না। দৈত্য-দানবের হাতে পড়ে এসব যাবে। এই ঘাসের জায়গায় উঠবে ইটের পাঁজা, আর নামবে ইটখোলার গর্তকুল। যেখানে গঙ্গার ছোট ছোট ঢেউগুলো ঘাসের সাথে খেলা করছে, সেখানে দাঁড়াবে পাটবোঝাই ফ্ল্যাট, আর সেই গাধা-বোট, ওই তাল-তমাল আর নিলের রঙ। ওই নীলাকাশ, মেঘের ব্যবহার ওসব কি আর দেখতে পাবে? দেখবে পাথুরে কয়লার ধোঁয়া। তার মাঝে মাঝে ভূতের মতো অস্পষ্ট দাঁড়িয়ে আছে কলের চিমনি।'

স্বামীজীর এই নদী-ভাবনা, গঙ্গা ছাড়িয়ে প্রায় সব নদীর বেলায়ই সত্য। আমাদের এই ভূখণ্ডে আরও বেশি করে সত্য। বুড়িগঙ্গা থেকে তুরাগ বা ধলেশ্বরী, বালু থেকে শীতলক্ষ্যা সবখানেই দূষণের বিষবাষ্প আর দখলের ক্ষতচিহ্ন। তীর দখল করে গড়ে তোলা শিল্পের চিমনি বেয়ে কোথাও কালো ধোঁয়ার উদ্‌গিরণ তো কোথাও ইট-সিমেন্টের সুরম্য দালান। এসব দালানের কোনোটি আবাসিক, কোনোটি আবার বাণিজ্যিক। দখলের এই আগ্রাসনে জীবনদায়ী নদী তাই বিশীর্ণ-কৃষকায়।

শীর্ণশরীরী মৃতপ্রায় এসব নদীকে এবার প্রাণ ফিরিয়ে দেওয়ার পালা। বর্তমান সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে কয়েক বছর ধরে সেই কাজটিই করে চলেছে অভ্যন্তরীণ নৌপথের সংরক্ষক বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)। দখলদারদের হাত থেকে তীরভূমি মুক্ত করে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে নদীর কাছে। ঢাকার চারপাশের নদীগুলো আবার যাতে বন্দি না হয়, চলছে সেই আয়োজনও। স্থায়ী সীমানা পিলার স্থাপন করে নদীতীরে নির্মিত হচ্ছে ওয়াকওয়ে। চলছে ইকোপার্ক নির্মাণ, বনায়নসহ অন্যান্য কর্মযজ্ঞ।

ঢাকার চারপাশের নদী ভরাট ও দূষণ পরিক্রমা

স্বচ্ছ পানি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে এককালে শীতলক্ষ্যার সুনাম ছিল সুবিদিত। মধ্যযুগ থেকে শুরু করে ব্রিটিশদের আগমনের পর অনেক দিন পর্যন্ত সবাই এই নদীর পানির অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। সেকালে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য অনেকেই শীতলক্ষ্যার বুকে নৌকা নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন। শীতলক্ষ্যার পানি কতটা সুপেয় ছিল তৎকালীন ডেভিড কোম্পানিই তার প্রমাণ। এই পানি দিয়ে তারা সোডা ওয়াটার বানিয়ে বোতলের গায়ে লিখে দিত 'মেড বাই শীতলক্ষ্যা ওয়াটার'।

তুরাগ নদ ছিল এককালে টঙ্গীবাসীর আশীর্বাদ। আর বুড়িগঙ্গার অতীত তো উজ্জ্বল বর্ণমালায় প্রদীপ্ত। ১৮৪০ সালে লেখা জেমস টেলরের 'টপোগ্রাফি অব ঢাকা' তার সাক্ষী। টেলর সাহেবের লেখায় বুড়িগঙ্গার মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে ধরা দিয়েছে ঢাকা। সেই সময় তিনি লেখেন, 'ধলেশ্বরীর সাথে বুড়িগঙ্গার সঙ্গমস্থলের উপরে বুড়িগঙ্গার উত্তর তীরে ঢাকার অবস্থান। এইখানে নদীটি বেশ গভীর ও নৌকা চলাচলের উপযোগী। বর্ষাকালে নদী বেশ প্রশস্ত হয়। মিনার ও বৃহৎ অট্টালিকা শোভিত ঢাকা শহরকে তখন পাশ্চাত্যের জলোত্থিত ভেনিস নগরী বলে মনে হয়।'

বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা ও বালু নদকে আশ্রয় করেই ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও টঙ্গীর শিল্প-বাণিজ্যের পত্তন। এদের আশীর্বাদেই প্রসার। পত্র-পল্লবে বিকশিত মহীরুহ এই শিল্পের অনাচারে সেই নদীরই বিপন্নতা। নদীর তলদেশে নানা আবর্জনার ১০-১২ ফুট স্তর। বিপন্ন নদীর পরিবেশ, ব্যবহার অযোগ্য এর পানিও। শুধু শিল্পের বর্জ্য নয়, মানববর্জ্য, বিভিন্ন ধরনের কঠিন বর্জ্য এবং সিটি করপোরেশন, ওয়াসা ও পৌরসভার বর্জ্যও ভরাট করেছে নদীর তলদেশ। বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, বালু ও শীতলক্ষ্যা নদী দূষণের জন্য দায়ী ৬০ শতাংশই শিল্প বর্জ্য। এর মধ্যে ৩৭ থেকে ৪০ শতাংশই ট্যানারি বর্জ্য। এছাড়া দূষণের জন্য দায়ী পলিথিন, গার্বেজ, নারকেলের ছোবড়া, কাদামাটি ও বালু, মেডিকেল বর্জ্যের মতো কঠিন বর্জ্যের হিস্যা ১৫ শতাংশ ও ১৫ শতাংশ মানববর্জ্য। নদী এলাকায় বসবাসকারী মানুষ ও নৌপথে চলাচলকারী নৌযান দ্বারাও ১০ শতাংশ দূষিত

হচ্ছে এসব নদী। ঢাকার চারপাশের নদীগুলোর এ দূষণের জন্য দায়ী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৯৫টি।

১. কঠিন বর্জ্য

বর্জ্যের উৎপত্তি বহুদিন আগে থেকেই, মনুষ্য কর্মকাণ্ডের অঙ্গ হিসেবে। তবে তখনকার দিনের বর্জ্যগুলো ছিল বায়ো ডিগ্রেডেবল (ভঙ্গুর)। তাই প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই সেগুলো পুনরাবর্তিত হতো। শিল্পবিপ্লব-পরবর্তী যুগে প্রাকৃতিক সম্পদের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার ও জীবনযাপনকে আরও সহজ, ভোগ্য ও আধুনিক করার তাগিদে বেড়েছে প্রাণ-প্রকৃতির জন্য বিপর্যয় সৃষ্টিকারী নন-বায়ো ডিগ্রেডেবল বা কঠিন বর্জ্যের। পয়ঃবর্জ্য, গৃহস্থালি বর্জ্য, হাটবাজারের বর্জ্য ও বালু ব্যবসার ফলে সৃষ্ট বর্জ্য এর মধ্যে অন্যতম।

১.১. পয়ঃবর্জ্য: পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পরিশোধনের দায়িত্ব মূলত ঢাকা ওয়াসার। তাদের হিসাব অনুযায়ী, ঢাকা মহানগরীতে প্রতি বছর পয়ঃবর্জ্য উৎপন্ন হয় প্রায় ১৩ লাখ ঘনমিটার। এর মধ্যে পরিশোধনক্ষম ১ লাখ ২০ হাজার ঘনমিটার। পাগলা পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগারের মাধ্যমে মাত্র ৫০ হাজার ঘনমিটার পরিশোধন করা হচ্ছে। বাকি ১২ লাখ ৫০ হাজার ঘনমিটার বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় সরাসরি নদীতে পড়ছে, যা নদীর পানির গুণগত মানের অবনতি ঘটাচ্ছে। ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়ছে নদীর পানি।

১.২. গৃহস্থালি বর্জ্য: ঢাকার গৃহস্থালি বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনের। পর্যাপ্ত ডাস্টবিন এবং ট্রান্সফার স্টেশন না থাকায় এই বর্জ্যের ব্যবস্থাপনাও সঠিকভাবে হচ্ছে না। ফলে পয়ঃবর্জ্যের মতো গৃহস্থালি বর্জ্যও সরাসরি নদীতে গিয়ে মিশছে। এর একটি বড় অংশ নাগরিকরা সরাসরি নদীতে ফেলছে। সিটি করপোরেশনের মাধ্যমেও বিভিন্নভাবে এই বর্জ্য নদীতে গিয়ে পড়ছে।

১.৩. হাটবাজারের বর্জ্য: নদীর তীরে হাঁটবাজারে প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ বর্জ্য উৎপন্ন হয়। এসব বর্জ্যের পাশাপাশি বিভিন্ন আড়ত, দোকান থেকে পচা ফল, মাছ, সবজি ও পলিথিন জাতীয় কঠিন পদার্থও সরাসরি নদীতে ফেলা হচ্ছে। এর ফলে নদীর দূষণ তো হচ্ছেই, তলদেশও ভরাট হয়ে যাচ্ছে।

১.৪. বালুর ব্যবসার ফলে সৃষ্ট বর্জ্য: ঢাকার চারপাশের নদীর পাড় ঘেঁষে অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠেছে বালুর ব্যবসা। এসব বালুও নদীতে পড়ে তলদেশ ভরাট হয়ে যাচ্ছে।

২. শিল্প বর্জ্য

শিল্পোৎপাদন প্রক্রিয়ায় যে বর্জ্য উৎপন্ন হয় তাই শিল্প বর্জ্য। এটা কঠিন হতে পারে আবার অর্ধকঠিন বা তরলও হতে পারে। শিল্পে উৎপন্ন এই বর্জ্যে নদী যেমন দূষিত হয়, একইভাবে দূষিত হতে পারে আশপাশের মাটি, লেক এমনকি ভূগর্ভস্থ পানিও। শিল্প বর্জ্যে ঢাকার চারপাশের নদীদূষণের বড় উৎস ট্যানারি বর্জ্য এবং টেক্সটাইল ডায়িং, পোশাক শিল্প ও অন্যান্য কলকারখানার অপরিশোধিত তরল বর্জ্য।

২.১. ট্যানারি বর্জ্য: হাজারীবাগের ট্যানারিগুলো থেকে একসময় দৈনিক প্রায় ২১ হাজার ঘনমিটার অপরিশোধিত বর্জ্য সরাসরি নদীতে নিক্ষিপ্ত হতো। ট্যানারি থেকে নিক্ষিপ্ত বিষাক্ত তরল ও কঠিন বর্জ্য বুড়িগঙ্গার পানিসহ নদীর তলদেশ এবং উভয় পাড়ের মাটি ও বাতাসকে ভয়ংকরভাবে দূষিত করে তোলে। হাজারীবাগ থেকে ট্যানারি শিল্প সাভার চামড়া শিল্প নগরীতে স্থানান্তরিত করা হচ্ছে। ১০০টির মতো ট্যানারি ইতোমধ্যেই সেখানে উৎপাদন শুরু করেছে। তবে সেগুলোর বর্জ্যও এখন পর্যন্ত পুরোপুরি পরিশোধিত হচ্ছে না। ফলে বুড়িগঙ্গার পরিবর্তে এখন ধলেশ্বরীর পানি দূষিত হচ্ছে।

২.২. কল-কারখানার বর্জ্য: টেক্সটাইল, ডায়িং, পোশাক ও অন্যান্য কলকারখানার তরল বর্জ্যও ঢাকার চারপাশের নদীদূষণের অন্যতম উৎস। এসব কলকারখানা থেকে প্রতিদিন প্রায় ৯০ হাজার ঘনমিটার বর্জ্য সরাসরি নদীতে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। অধিকাংশ শিল্প-কারখানাগুলোর ইটিপি না থাকায় এবং থাকলেও সেগুলো চালু না রাখার কারণে এসব শিল্প-কারখানার বর্জ্য পরিশোধন ছাড়াই সরাসরি নদীতে গিয়ে মিশছে এবং নদীর পানি দূষিত করছে।

৩. অন্যান্য বর্জ্য

অন্যান্য বর্জ্যের মধ্যে নদীর পাড়ে গড়ে ওঠা বিভিন্ন হাসপাতালের মেডিকেল বর্জ্য অনেক সময় সরাসরি নদীতে ফেলে দেওয়া হয়। এর ফলে নদীর পরিবেশ ও পানি মারাত্মকভাবে দূষিত হচ্ছে। এছাড়া নদীতে চলাচলকারী নৌযান থেকে তেল, পয়ঃ এবং কঠিন বর্জ্যও সরাসরি নদীতে পড়ছে। নদীর পাশে অবস্থিত ইটভাটার কারণেও নদীর দূষণ হচ্ছে। দূষণের আরেকটি বড় কারণ ব্যবহৃত পলিথিন নদীতে ফেলে দেওয়া। এর ফলে কেবল দূষণ নয়, নদীর তলদেশ ভরাটও হয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি নদীর পাড়ে যত্রতত্র গড়ে ওঠা অসংখ্য ডকইয়ার্ডে সৃষ্ট বিভিন্ন ধরনের বর্জ্যও নদীদূষণের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। জনগণের সচেতনতার অভাবও এজন্য দায়ী।

দখল পরিক্রমা

নদী দখলের ইতিহাস খুঁজতে চাইলে ঢাকার প্রাণরেখা বুড়িগঙ্গার কাছে যেতে হবে সবার আগে। বিআইডব্লিউটিএ'র সীমানা পিলারের তোয়াক্কা না করে বুড়িগঙ্গার বুকে দখলের রাজত্ব কায়েম হয়েছে বারবার। এটা গতি পায় মূলত দুই দশক আগে, বুড়িগঙ্গা ও ধলেশ্বরীর মিলনস্থল থেকে। যমুনা ও ধলেশ্বরীর প্রবাহ হ্রাস পাওয়ায় একসময় বুড়িগঙ্গার আদি চ্যানেলেও পানি কমতে শুরু করে। এই সুযোগটাই কাজে লাগায় দখলদারেরা। বুড়িগঙ্গার আদি ধারাটি দখল করে স্থাপনা নির্মাণ করতে থাকে। সদরঘাট টার্মিনাল থেকে গাবতলী ব্রিজ পর্যন্ত নদীর দুই ধারে গড়ে ওঠে অসংখ্য অবৈধ স্থাপনা। আইনের তোয়াক্কা না করে ডকইয়ার্ডগুলোও নদীতে রেখেই জাহাজ মেরামত করতে থাকে।

বুড়িগঙ্গার পর ভয়ংকর আগ্রাসনের মুখে পড়তে হয় একদা স্বচ্ছ ও সুপেয় পানির নদী শীতলক্ষ্যাকে। মূলত নারায়ণগঞ্জ নদীবন্দর ঘিরেই চলে দখলের এই মচ্ছব। নদীর তীর বেঁধে ফেলে নির্মাণ করা হয় ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান, শিল্প-কারখানা ও অন্যান্য স্থাপনা। সময়ের পরিক্রমায় বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যার মতো তুরাগ ও বালু নদকেও জোর করে বেঁধে ফেলতে থাকে মানুষ। পর্যাপ্ত পানিপ্রবাহের অভাবে শুকিয়ে মরে যাওয়া নদীবক্ষে উঠতে থাকে বাড়িঘর, দোকান, কারখানা।

মুক্তির পথরেখা

জালের মতো ছড়িয়ে থাকা নদী ঘিরেই আমাদের জীবন। কৃষি, পরিবহন, ব্যবসা-বাণিজ্য, সভ্যতা ও ইতিহাসের বিকাশও এই নদী ঘিরেই। আমরা নদীরই সন্তান, আমাদের জন্য নদীর সেবা তাই অবিশ্রান্ত। তবে নদীও যেন স্বস্তি পায়, সে বিষয়টিও এখন আলোচিত হচ্ছে জোরেশোরে। নদী যাতে মুক্ত ধারায় প্রবাহিত হতে পারে সেই উদ্যোগই চলছে; আইন করে এবং সেই আইন প্রয়োগের মাধ্যমে।

২০১১ সালে পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নে সংবিধানে ১৮ক নামে যে ধারাটি সংযোজন করা হয়েছে, নদী রক্ষার বিষয়টি তার মধ্যেই নিহিত আছে। ধারাটিতে পরিষ্কার করে বলা আছে- 'রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করিবেন।' অর্থাৎ সব প্রাকৃতিক সম্পদের মতো নদীকেও যেকোনো আগ্রাসন, তা সে দখল হোক বা দূষণ, রক্ষা করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের।

নদী রক্ষায় উচ্চ আদালত থেকেও একাধিক রায় এসেছে। প্রথম গুরুত্বপূর্ণ রায়টি আসে ২০০৯ সালে। ঢাকার চারপাশের নদীগুলোর দূষণ, অবৈধ দখল ও নদীর ভেতরে বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণের বৈধতা নিয়ে দায়ের করা এক রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ৯ দফা নির্দেশনাসহ রায় দেয় সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ। নির্দেশনায় সিএস ও আরএস ম্যাপ অনুসারে নদীগুলোর সীমানা জরিপ করা ও সীমানা পিলার স্থাপন

প্রথম পর্যায়ে ২০ কিলোমিটার ওয়াকওয়ে নির্মাণের কাজ ইতোমধ্যেই শেষ হয়েছে ■ ছবি: বিআইডব্লিউটিএ

করতে বলা হয়। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন গঠনেও সরকারকে পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানানো হয় রায়ে।

সেই মোতাবেক ২০১৩ সালে নদী রক্ষা কমিশন আইন পাস হয়েছে। আইনটির বলে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন নামে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কমিশনের দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে–নদীর অবৈধ দখল, শিল্প-কারখানা কর্তৃক নদীদূষণ, নদীর উপর অবৈধ কাঠামো নির্মাণ ও নানাবিধ অপরাধ রোধ করা। নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ পুনরুদ্ধারের পাশাপাশি নদীর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ এবং নদীকে নৌ-পরিবহনযোগ্য হিসেবে গড়ে তোলাসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নদীর বহুমাত্রিক ব্যবহার নিশ্চিত করাও কমিশনের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

২০১৯ সালে উচ্চ আদালতের আরেকটি রায়ে তুরাগকে আইনিসত্তা বা জীবন্তসত্তা ঘোষণা করা হয়। পাশাপাশি বলা হয়, বাংলাদেশের মধ্যে এবং বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত সব নদ-নদী একই মর্যাদা পাবে। এগুলো রক্ষা ও সংরক্ষণে নদী রক্ষা কমিশনকে 'আইনগত অভিভাবক' ঘোষণা করা হয়।

বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, বালু, শীতলক্ষ্যাসহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ সব নদ-নদীর নাব্যতা রক্ষা ও দখলমুক্ত করতে ২০১৪ সালে ৩৭ সদস্যের টাস্কফোর্স গঠন করেছে সরকার। নৌ-পরিবহনমন্ত্রীর সভাপতিত্বে টাস্কফোর্সের সদস্য হিসেবে রাখা হয় শিল্প, স্থানীয় সরকার, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত, পানিসম্পদ, পরিবেশ ও বন, আইন ও ভূমিমন্ত্রীকে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর সচিব, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) ও রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) চেয়ারম্যান এবং পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) ও পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালককেও টাস্কফোর্সে সদস্য করা হয়। ঢাকার আশপাশের চার নদীসহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ নদ-নদী রক্ষায় প্রয়োজনীয় সুপারিশ ও পরামর্শ প্রদান এবং তা বাস্তবায়নে ৩৮টি সভা করে এ টাস্কফোর্স। আওয়ামী লীগ টানা তৃতীয় মেয়াদে সরকার গঠনের পর নৌ-পরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এমপির নেতৃত্বে আরও একটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়।

বিআইডব্লিউটিএ'র উদ্যোগ ও বাস্তবায়ন

ঢাকার চারদিকের নদীগুলোর প্রবাহ বিঘ্নিত হওয়ার শুরু বহু আগে থেকেই। প্রায় দেড়শ বছর আগে থেকেই বুড়িগঙ্গার প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয়েছে। বুড়িগঙ্গার মুখে চর পড়ার খবর উঠে এসেছে সেই ১৮৮৬ সালেই পত্রিকার পাতায়। পাকিস্তান আমলেও নগর পরিকল্পনাবিদ ও নগর প্রশাসনের চিন্তায় বুড়িগঙ্গা তথা ঢাকার চারপাশের নদীগুলো তেমন স্থান পায়নি। তারপর কেটে গেছে বহু বছর। নদীগুলোর গতিপ্রবাহে ভাটা পড়েছে। শিল্প ও পয়ঃবর্জ্য নির্গমনের পরিমাণ বেড়েছে। জঞ্জালের চাপে পথ হারানো এসব নদীকেই এবার পথ দেখানোর উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)। উদ্যোগের দৃশ্যমান সাফল্যও ইতোমধ্যে এসেছে।

১. নৌপথ পুনরুদ্ধার ও সৃষ্টি ঢাকা শহরের যানজট নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়নের কথা বিবেচনায় নিয়ে আশপাশের নৌপথগুলো উন্নয়নের বিষয়টি আলোচনায় আসে ৯০-এর দশকে। ১৯৯৩ সালের ৩ জানুয়ারি পরিকল্পনা কমিশনে গ্রেটার ঢাকা মেট্রোপলিটন ট্রান্সপোর্ট স্টাডি (ডিআইটিএস) শীর্ষক স্টাডির ওপর

নারায়ণগঞ্জের কাঁচপুর উপজেলার খানপুরে নির্মিত হয়েছে দৃষ্টিনন্দন ইকোপার্ক ■ *ছবি: বিআইডব্লিউটিএ*

অনুষ্ঠিত স্টিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিআইডব্লিউটিএ ঢাকা শহরের চারদিকে নৌপথ চালুকরণের নিমিত্তে একটি প্রাথমিক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা চালায়। সমীক্ষার আলোকে 'ঢাকা শহরের চারদিকে নৌপথ চালুকরণ (১ম পর্যায়): সদরঘাট থেকে আশুলিয়া ব্রিজ পর্যন্ত নৌপথের নাব্যতা উন্নয়ন ও ল্যান্ডিং সুবিধাদি প্রদান' শীর্ষক একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। প্রায় ৩৬ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি ২০০০ সালের জুলাই মাসে শুরু হয়ে ২০০৪ সালের ডিসেম্বরে শেষ হয়। এর ফলে সদরঘাট থেকে আশুলিয়া পর্যন্ত নতুন নৌরুটের সৃষ্টি হয়। সারা বছর পানির প্রবাহ থাকায় এই অংশে নৌযান চলাচলের পাশাপাশি পরিবেশেরও উন্নয়ন হয়েছে। মৎস্য চাষ ও সেচের জন্য পর্যাপ্ত পানি থাকছে। ছোট ছোট দেশীয় নৌকায় সারা বছরই পর্যটকেরা ভ্রমণ করছেন।

প্রকল্পটির সাফল্যে আশুলিয়া ব্রিজ থেকে টঙ্গী হয়ে কাঁচপুর পর্যন্ত নৌপথের নাব্যতা উন্নয়নে 'ঢাকা শহরের চারদিকে বৃত্তাকার নৌপথ চালুকরণ (২য় পর্যায়)' শীর্ষক আরেকটি প্রকল্প গ্রহণ করে বিআইডব্লিউটিএ। সাড়ে ৫৪ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটির কাজ শুরু হয় ২০০৮ সালের জুলাইয়ে এবং ২০১২ সালের জুনে সমাপ্ত হয়। এর ফলে সোয়ারীঘাট থেকে আশুলিয়া-টঙ্গী হয়ে কাঁচপুর পর্যন্ত ৭০ কিলোমিটার খননের মাধ্যমে ঢাকা শহরের চারদিকে ১১০ কিলোমিটার নৌপথ পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। পাশাপাশি ঢাকার অভ্যন্তরের রামপুরা, বাড্ডা/শাহজাদপুর ও গোবিন্দপুর খাল তিনটি খননের মাধ্যমে ড্রেনেজ ব্যবস্থাও উন্নত হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে সোয়ারীঘাট থেকে মিরপুর পর্যন্ত ২০০ ফুট প্রশস্ত ও ১৪ ফুট গভীর এবং মিরপুর থেকে আশুলিয়া-টঙ্গী হয়ে কাঁচপুর পর্যন্ত ১২০ ফুট প্রশস্ত ও ৮ ফুট গভীরতার নৌপথ সৃষ্টি হয়েছে।

প্রকল্পগুলোর আওতায় মোট ১৪টি স্থানে ল্যান্ডিং স্টেশনও নির্মাণ করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম পর্যায়ে নির্মাণ করা হয়েছে ১০টি স্টেশন। এগুলো হলো সোয়ারীঘাট, নবাববাগ, খোলামুড়া, রায়েরবাজার, বসিলা/ঝাউচর, গাবতলী, আমিনবাজার, সিন্নিরটেক, বিরুলিয়া ও আশুলিয়া। দ্বিতীয় পর্যায়ে টঙ্গী, ইছাপুরা, কায়েতপাড়া ও কাঁচপুরে আরও চারটি ল্যান্ডিং স্টেশন নির্মাণ করা হয়েছে। ল্যান্ডিং স্টেশনগুলো ইজারা দেওয়ার ফলে প্রতি বছর উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রাজস্বও আসছে।

নাব্যতা বৃদ্ধি: একদা অবিরাম-অবিশ্রাম গতিতে বয়ে চলা বুড়িগঙ্গা, ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই নেওয়া সুন্দরতম শীতলক্ষ্যা, টঙ্গীর আশীর্বাদের উপাধেয় তুরাগের জলতরঙ্গ আবার ফিরিয়ে আনতে তৎপর সরকার। ঢাকার চারপাশের এসব নদীসহ কর্ণফুলীর দখল, দূষণরোধ ও নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে একটি মাস্টারপ্ল্যান ইতোমধ্যেই প্রণয়ন করা হয়েছে। মাস্টারপ্ল্যানটি বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিপরিষদ কমিটিও গঠন করা হয়েছে। মাস্টারপ্ল্যানের সুপারিশ অনুযায়ী কাজ করছে বিআইডব্লিউটিএ। ঢাকার চারপাশের নদীগুলোর নাব্যতা বৃদ্ধি এর মধ্যে অন্যতম। এর অংশ হিসেবে বালু নদ ও টঙ্গী খালের বেজলাইন ফিজিবিলিটি স্টাডির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। মাস্টারপ্ল্যান অনুমোদনের পর থেকে হাইড্রোগ্রাফিক জরিপের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় স্থানসমূহে সারা বছর ড্রেজিংও করছে সংস্থাটি। বুড়িগঙ্গা ও শীতলক্ষ্যা নদীর সাথে সংযুক্ত ২ দশমিক ৭৬ কিলোমিটার হাইক্কার খাল, ১ দশমিক ৭ কিলোমিটার চারারগোপ খাল এবং রামপুরা, বাড্ডা/শাহজাদপুর ও গোবিন্দপুরের তিনটি খালের প্রায় ১৩ কিলোমিটার খননের মাধ্যমে পুনরুদ্ধার করা হয়েছে।

ঢাকার চারপাশের নদীই কেবল নয়, ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে সারা দেশের নদীর নাব্যতা রক্ষায় বিআইডব্লিউটিএ'র বহরে ড্রেজারের সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে। '৩৫টি ড্রেজার ও সহায়ক জলযানসহ আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় আরও ড্রেজ ম্যাটেরিয়াল ক্যারিং বার্জসহ একটি পন্টুন, মাউন্টেড গ্রাব ড্রেজার, ৫টি এফিবিয়ান এক্সকাভেটর সংগ্রহের কাজও চলছে।

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারেই নদী রক্ষার অঙ্গীকারের কথা বলা আছে। তার আলোকে ঢাকার চারপাশের নদীগুলোর প্রশস্ততা ও গভীরতা বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিংয়ের (আইডব্লিউএম) সম্ভাব্যতা সমীক্ষা অনুযায়ী, ঢাকার চারপাশের নদীগুলোতে প্রায় ২১৬ লাখ ঘনমিটার মাটি খনন করলে শুষ্ক মৌসুমেও প্রায় পুরো নদীতে ১০-১৩ ফুট গভীর ও ২০০-৩০০ ফুট প্রশস্ত নৌপথ সৃষ্টি হবে। সে লক্ষ্যেই কাজ করছে বিআইডব্লিউটিএ।

২. দূষণরোধ: শীতলক্ষ্যার মোহনায় মিলিত হয়েছে গাজীপুরের বেলাইবিল, টঙ্গীর তুরাগ ও বেরাইদ ডেমরা এলাকার বালু নদ। শিল্পনগরী টঙ্গীর কল-কারখানার বর্জ্য দীর্ঘদিন ধরে এই নদীতেই ফেলা হয়। এতে বালু নদের পানির রঙ বদলে কালচে ও সবুজ বর্ণ ধারণ করে। বিষাক্ত বর্জ্য মিশ্রিতি বালু নদের পানি শীতলক্ষ্যায় পৌঁছে দূষিত করছে তার পানিকেও। শিল্প ও কল-কারখানা থেকে নির্গত বর্জ্যে বুড়িগঙ্গার পানিও ঘোলা, বিষাক্ত ও আবর্জনাময়।

নদীগুলোর এই দূষণের জন্য দায়ী শিল্প-কারখানার বর্জ্য, পয়ঃবর্জ্য ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ নিয়েছে বিআইডব্লিউটিএ। ঢাকার চারপাশের নদীগুলোতে ২২৬টি বর্জ্য উৎসমুখ এরই মধ্যে চিহ্নিত করা হয়েছে। বুড়িগঙ্গা তীরের সাতটি রেডিমিক্স কারখানার বর্জ্যনিক্ষেপণ মুখ ও শীতলক্ষ্যা তীরে ৪২টি পয়ঃবর্জ্য নিক্ষেপণ মুখ ইতোমধ্যেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

যাত্রীবাহী নৌযানের কঠিন বর্জ্যও নদীদূষণের অন্যতম কারণ। এসব বর্জ্য নদীতে ফেলা বন্ধ করতে বিআইডব্লিউটিএ'র পক্ষ থেকে নৌযান মালিক সমিতিকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি যাত্রীবাহী নৌযানে বিন স্থাপন করে তা থেকে কঠিন বর্জ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে।

এছাড়া ঢাকার চারপাশের নদীসহ সব নদীর ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল পরিবেশসম্মত উপায়ে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিআইডব্লিউটিএ'র উদ্যোগে স্থানীয় জনগণের সাথে আলোচনা ও তাদের উৎসাহিত করে সমন্বয়ের মাধ্যমে সরকারি/ব্যক্তিমালিকানাধীন নিচু জমিতে ডাইক নির্মাণ করে সেখানে ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল ফেলা হচ্ছে।

পাইলট ভিত্তিতে বুড়িগঙ্গার ৩ কিলোমিটার ও তুরাগ নদের ১ কিলোমিটারে প্রায় ৮ দশমিক ৪৪ লাখ ঘনমিটার পলিথিনসহ বর্জ্য ইতোমধ্যেই অপসারণ করা হয়েছে। নদীতীরের বর্জ্য অপসারণের জন্য ৯টি লংবুম এক্সকাভেটার সংগ্রহের পর সেগুলো দিয়ে নিয়মিত উচ্ছেদ ও বর্জ্য অপসারণ অব্যাহত রয়েছে।

৩. ৫ হাজার ২০০ সীমানা পিলার স্থাপন

নদীর জমি যাতে কেউ আর দখল করতে না পারে সে লক্ষ্যে ২০০৯ সালে উচ্চ আদালতের এক আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন, গণপূর্ত বিভাগ ও জরিপ অধিদপ্তরের সাথে যৌথ জরিপের মাধ্যমে বুড়িগঙ্গা, বালু, তুরাগ ও শীতলক্ষ্যা নদীর ফোরশোর লাইন (তটরেখা) ও তীরভূমি চিহ্নিত করে বিআইডব্লিউটিএ। সিএস এবং আরএস মৌজা ম্যাপের ভিত্তিতে সীমানা চিহ্নিতের কাজটি করা হয়। পরবর্তীতে গণপূর্ত বিভাগ সীমানা চিহ্নিত এলাকায় পিলার স্থাপন করে। কিন্তু পিলারগুলো সঠিক স্থানে না হওয়ায় ২০১২ সালে আপত্তিসহ সীমানা পিলার বুঝে নেয় বিআইডব্লিউটিএ। আপত্তি নিষ্পত্তিতে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন সিএস ম্যাপ, আরএস ম্যাপ, ফোরশোর ম্যাপ ও জিপিএস প্রয়োগে আপত্তিকৃত সীমানা পিলারের পুনঃপরীক্ষা শুরু করে, এখনো যা চলমান আছে। বিআইডব্লিউটিএ বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা ও বালু নদের সীমানা নির্ধারণ করে ৭ হাজার ২০০টি পিলার স্থাপনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। 'বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা ও বালু নদের তীরভূমিতে পিলার স্থাপন, তীররক্ষা, ওয়াকওয়ে ও জেটিসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ (দ্বিতীয় পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৫ হাজার ২০০টি পিলার স্থাপনের কাজ ইতোমধ্যেই শেষ হয়েছে।

৪.অবৈধ দখলমুক্তকরণ: উচ্চ আদালতের নির্দেশনার আলোকে নদীকে দখলমুক্ত করতে অনেক দিন ধরেই অভিযান পরিচালনা করে আসছে বিআইডব্লিউটিএ। তবে দখলদারদের বিরুদ্ধে জোরেশোরে অভিযান শুরু হয় ২০১৯ সালের ২৯ জানুয়ারি। বুড়িগঙ্গার কামরাঙ্গীরচর থেকে শুরু হয় নদী উদ্ধার অভিযান। নদী দখলমুক্ত করার এ অভিযানে শুধু বুড়িগঙ্গার দুই পাড়ে অসংখ্য অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করে বিআইডব্লিউটিএ। উচ্ছেদকৃত স্থাপনার মধ্যে অবৈধ টিনের স্থাপনা যেমন রয়েছে, একইভাবে আছে নদীর জায়গায় গড়ে তোলা অসংখ্য বহুতল ভবন ও স্থাপনা। এ থেকে বাদ পড়েনি স্থানীয় প্রভাবশালীদের অবৈধভাবে দখল করা কোটি টাকার ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানও। উচ্ছেদ চলাকালে তুরাগের দুই পাড় টঙ্গী ও আশুলিয়া, বালু, ধলেশ্বরী ও শীতলক্ষ্যা দখল করে গড়ে তোলা অসংখ্য অবৈধ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান গুঁড়িয়ে দিয়েছে সংস্থাটি।

স্বাধীনতার পর সবচেয়ে জোরালো এই অভিযান পরিচালনা করতে গিয়ে নানা রকম প্রতিবন্ধকতার মুখেও পড়তে হয় অভিযান পরিচালনাকারী কর্মকর্তাদের। কোথাও কোথাও নকল কাগজপত্র তৈরি করে ও নিজেদের ইচ্ছেমতো সীমানা পিলার বসিয়ে উচ্ছেদ ঠেকানোর চেষ্টা করতে দেখা যায় দখলদারদের। তবে এসব অপকৌশলের কোনোটিই উচ্ছেদ আটকাতে পারেনি।

সবমিলিয়ে ২৯ জানুয়ারি থেকে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত মোট ৩৬ কার্যদিবসেই ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের চারপাশের নদী দখল করে গড়ে তোলা ৪ হাজার ১৫টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করেছে বিআইডব্লিউটিএ। নদীর জায়গা অবমুক্ত হয়েছে প্রায় ১১৩ একর। তবে গত এক দশকে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ নদীবন্দর এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান চালিয়ে উদ্ধার করা হয়েছে প্রায় ৭১৬ একর তীরভূমি।

ঢাকা নদীবন্দরে উদ্ধার ৪৯৩ একর তীরভূমি: গত এক দশকে উচ্ছেদ অভিযানের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি জমি অবমুক্ত করা হয়েছে ঢাকা নদীবন্দরের। ২০১০ সালের এপ্রিল থেকে ২০২১ সালের মার্চ পর্যন্ত ঢাকা নদীবন্দর এলাকার ১৬ হাজার ৫২৪টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করেছে বিআইডব্লিউটিএ। এসব অভিযানের মাধ্যমে উদ্ধার করা হয়েছে ঢাকা নদীবন্দর এলাকার ৪৯৩ দশমিক ১৪ একর তীরভূমি। এই সময় উচ্ছেদকৃত সম্পদ নিলামে তুলে ও অবৈধ দখলের দায়ে জরিমানাসহ আদায় হয়েছে মোট ১৬ কোটি ৯০ লাখ ১৪ হাজার ৯৬০ টাকা।

নারায়ণগঞ্জ নদীবন্দরে উদ্ধার ২২৩ একর জমি: দেশের গুরুত্বপূর্ণ নদীবন্দর নারায়ণগঞ্জে অভিযান চালিয়ে গত এক দশকে ২২২ দশমিক ৭৫ একর তীরভূমি উদ্ধার করেছে বিআইডব্লিউটিএ। ২০১০ সালের মার্চ থেকে ২০২১ সালের মার্চ পর্যন্ত শীতলক্ষ্যা তীরের মোট ৪ হাজার ৭৬৯টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করে এই পরিমাণ জমি উদ্ধার করা হয়েছে। উচ্ছেদকৃত এই সম্পদ নিলামে তুলে ও জরিমানা আদায়ের মাধ্যমে আয় হয়েছে মোট ২ কোটি ৮৫ লাখ ৩৬ হাজার ৬০০ টাকা।

এছাড়া ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ নদীবন্দর এলাকায় অবৈধ দখলের অভিযোগে মামলা হয়েছে দুটি। ১২ জনের বিভিন্ন মেয়াদে জেল হয়েছে। পাশাপাশি দুই নদীবন্দর এলাকা থেকে ৫০০ টন বর্জ্য অপসারণ ও এক লাখ ঘনফুট বালু উত্তোলন করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রকল্পের অন্যতম অঙ্গ আরসিসি সিঁড়ি নির্মাণ ■ ছবি: বিআইডব্লিউটিএ

ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ নদীবন্দরে উচ্ছেদ কার্যক্রম

ঢাকা নদীবন্দর (২০১০-২০২১)	
স্থাপনার ধরন	**সংখ্যা**
পাকা	---
আধা-পাকা	---
অন্যান্য	---
উচ্ছেদকৃত মোট স্থাপনা	১৬,৫২৪
উদ্ধারকৃত তীরভূমি	৪৯৩.১৪ একর
নিলাম ও জরিমানা আদায়	১৬,৯০,১৪,৯৬০ টাকা

নারায়ণগঞ্জ নদীবন্দর (২০১০-২০২১)	
স্থাপনার ধরন	**সংখ্যা**
পাকা	---
আধা-পাকা	---
অন্যান্য	---
উচ্ছেদকৃত মোট স্থাপনা	৪,৭৬৯
উদ্ধারকৃত তীরভূমি	২২২.৭৫ একর
নিলাম ও জরিমানা আদায়	২,৮৫,৩৬,৬০০ টাকা

৫. পুনর্দখল রোধে পদক্ষেপ

উনিশ শতকে নগর পরিকল্পনায় ঢাকার চারপাশের নদী বিশেষ করে বুড়িগঙ্গার একটা স্থান ছিল। কারণ নদীর তীরকে তখন ব্যবহার করা হতো বিনোদন কেন্দ্র হিসেবে। এবার শুধু বুড়িগঙ্গা নয়, শীতলক্ষ্যা, তুরাগ ও বালু নদরে তীরকেও বিনোদন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। নদীর তীরভূমি দখলমুক্ত করার পর আবার তা বেদখল হওয়ার রেওয়াজ ভাঙাও এর আরও একটি উদ্দেশ্য। আর পুনর্দখল রোধে নদীর তীরে আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল/গাইড ওয়াল নির্মাণ করা এবং ওয়ালের কাছে ওয়াকওয়ে, স্টেপ্স/স্টেয়ারস নির্মাণ, জেটি নির্মাণ, বসার বেঞ্চ, বৃক্ষরোপণ সবচেয়ে ফলপ্রসূ পদক্ষেপ হিসেবে স্বীকৃত। সে আলোকে উচ্ছেদের পাশাপাশি দখলরোধে নদীর তীর বরাবর ওয়াকওয়ে নির্মাণ করছে বিআইডব্লিউটিএ। ঢাকার চারদিকে নদীর তীরসমূহের মধ্যে গাবতলী/আমিনবাজার, টঙ্গী এলাকা, কাঁচপুর, টানবাজার এলাকা ও শ্যামপুর থেকে ফতুল্লা পর্যন্ত এলাকা অবৈধ দখলমুক্ত রাখতে প্রায় ২০ কিলোমিটার নদীর তীররক্ষাসহ ওয়াকওয়ে নির্মাণের কাজ ইতোমধ্যেই শেষ হয়েছে। বুড়িগঙ্গার তীরে শ্যামপুরের কদমতলী ও নারায়ণগঞ্জের খানপুরের তীরভূমি থেকে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের পর সেখানে বিভিন্ন প্রজাতির গাছ লাগিয়ে এবং বিভিন্ন রাইডস প্রদান করে দুটি দৃষ্টিনন্দন ইকোপার্কও ইতোমধ্যেই নির্মাণ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে ৫২ কিলোমিটারের তীররক্ষাসহ ওয়াকওয়ে কাজ চলমান আছে। তৃতীয় পর্যায়ে আরও ১৫০ কিলোমিটার ওয়াকওয়ে নির্মাণ করা হবে। এ লক্ষ্যে 'ঢাকা শহরের চারপাশে বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, ধলেশ্বরী, শীতলক্ষ্যা ও বালু নদের তীরভূমিতে তীররক্ষা, ওয়াকওয়ে ও জেটিসহ আনুষঙ্গিক

ঢাকার চারপাশের নদীতীর আর দখল করা যাবে না »

মো. নুরুল আলম
প্রকল্প পরিচালক ও সদস্য (অর্থ)
বিআইডব্লিউটিএ

ঢাকার চারপাশের নদীগুলোকে দখলমুক্ত করে সীমানাপ্রাচীর স্থাপন এবং নদীর পাড়ে ওয়াকওয়ে ও ইকোপার্ক তৈরি বলতে গেলে দুরূহ কাজ। সেই দুরূহ কাজটিই করছে বিআইডব্লিউটিএ। 'বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা ও বালু নদের তীরে পিলার স্থাপন, তীররক্ষা, ওয়াকওয়ে ও জেটিসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ (দ্বিতীয় পর্যায়)' প্রকল্পটি গ্রহণে কোন দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করেছে?

মো. নুরুল আলম: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকার চারপাশের নদীগুলোকে আগের রূপে ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দিয়েছেন। সে অনুযায়ী নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় আমরা কাজ করছি। একটা সময় নদীর জমি দখলমুক্ত করার পর আবার তা বেদখল হয়ে যেতে দেখেছি। এর পুনরাবৃত্তি যাতে না হয়, সে জন্যই স্থায়ী সমাধান হিসেবে নদীর সীমানা নির্ধারণ করে পিলার স্থাপন, কি-ওয়াল ও ওয়াকওয়ে নির্মাণের প্রকল্পটি নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া নদীরক্ষায় উচ্চ আদালতেরও রায় আছে। এসব বিবেচনা থেকেই প্রকল্পটি নেওয়া হয়েছে।

নদীর তীর দখল করে স্থাপনা নির্মাণ বহু পুরনো সমস্যা। অনেক প্রভাবশালীও এর পেছনে আছেন বলে শোনা যায়। এসব অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কতটা সহজ ছিল?

মো. নুরুল আলম: মোটেই সহজ ছিল না। বিআইডব্লিউটিএ ২০১৯ সালের ২৯ জানুয়ারি ঢাকার চারপাশের নদ-নদীর অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে বড়সড় অভিযান শুরু করার পর একাধিক বাধা এসেছে। উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনাকারীদের ওপর হামলা পর্যন্ত হয়েছে। তাই বলে উচ্ছেদ অভিযান আমরা বন্ধ করিনি। দখলদারকে আমরা দখলদার হিসেবেই দেখেছি; প্রভাবশালী কিনা সেই বিবেচনায় যায়নি। মাননীয় নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী জনাব খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এমপি নিজেও অনেকবার নদী দখলদারদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানের কথা বলেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে ও নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় ঢাকার চারপাশের নদীগুলোর ৯০ শতাংশ অবৈধ স্থাপনা আমরা ইতোমধ্যেই উচ্ছেদ করেছি।

'বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা ও বালু নদের তীরে পিলার স্থাপন, তীররক্ষা, ওয়াকওয়ে ও জেটিসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ (দ্বিতীয় পর্যায়)' প্রকল্পের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হচ্ছে নদীর স্থায়ী সীমানা পিলার স্থাপন। এজন্য নদীর সীমানা নির্ধারণ আগে প্রয়োজন; তারপর পিলার স্থাপন। কতটা নির্বিঘ্নে সেটা করতে পারছেন?

মো. নুরুল আলম: নদীর সীমানা নির্ধারণের বিষয়ে উচ্চ আদালতের একটি রায় আছে। ২০০৯ সালের ওই রায়ে ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে (সিএস) ও রিভিশনাল সার্ভে (আরএস) ম্যাপ অনুসারে নদীর সীমানা জরিপ করতে বলা হয়েছে। হাইকোর্টের এই রায়ের আলোকে জরিপ চালিয়ে 'বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা ও বালু নদের তীরে পিলার স্থাপন, তীররক্ষা, ওয়াকওয়ে ও জেটিসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ (দ্বিতীয় পর্যায়)' প্রকল্পের আওতায় নতুন করে ১০ হাজার ৮২০টি সীমানা পিলার স্থাপনের লক্ষ্য ধরা হয়েছে। এর অংশ হিসেবে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও টঙ্গী নদীবন্দর এলাকায় নির্মাণ করা হচ্ছে ৭ হাজার ২০০টি পিলার। এর মধ্যে ঢাকা নদীবন্দর এলাকার ২ হাজার ২৩৩টি, টঙ্গী নদীবন্দর এলাকার ৫৭৭টি ও নারায়ণগঞ্জ নদীবন্দর এলাকার ৫৫০টিসহ মোট ৩ হাজার ৩৬০টি পিলার ইতোমধ্যেই দৃশ্যমান হয়েছে। এছাড়া ঢাকা নদীবন্দর এলাকার আরও ৮৫০টি পিলারের ৭০ ও টঙ্গী নদীবন্দর এলাকার ৫৬৬টি পিলারের ৪০ শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে। নারায়ণগঞ্জ নদীবন্দর এলাকার আরও ৯৩৫টি সীমানা পিলারের পাইলিংয়ের কাজও ইতোমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে।

প্রকল্পের অন্যান্য অঙ্গের অগ্রগতি কেমন?

মো. নুরুল আলম: কয়েকটি প্যাকেজে প্রকল্পের পূর্ত কাজ চলছে। এর মধ্যে রামচন্দ্রপুর থেকে বসিলা ও রায়েরবাজার খাল থেকে কামরাঙ্গীরচর পর্যন্ত সাড়ে ৩ কিলোমিটার ওয়াকওয়ের মধ্যে ৩ দশমিক ২ কিলোমিটার ইতোমধ্যেই দৃশ্যমান হয়েছে। ঢাকা, টঙ্গী ও নারায়ণগঞ্জ নদী বন্দরের অধীনে ২৪ কিলোমিটার ওয়াকওয়ের মধ্যে ১০ কিলোমিটারের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। অবশিষ্ট ১৪ কিলোমিটার ওয়াকওয়ের মূল্যায়ন চলছে। প্রকল্পের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হলো ইকোপার্ক। তিনটি ইকোপার্কের মধ্যে টঙ্গী নদী বন্দর এলাকার পার্কটির ৫২ শতাংশ অগ্রগতি হয়েছে। এছাড়া ঢাকা ও টঙ্গী নদী বন্দরের অধীনে নির্মাণাধীন ৬টি ভারী জেটি নির্মাণ কাজের অগ্রগতি হয়েছে ৮৮ শতাংশ। পরিবেশকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে প্রকল্পে। এ লক্ষ্যে নদীর তীরে ব্যাপক হারে বৃক্ষরোপণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কয়েক হাজার গাছ ইতোমধ্যেই রোপণ করা হয়েছে।

প্রকল্পের কলেবর বাড়িয়ে সংশোধিত প্রকল্প প্রস্তাব (আরডিপিপি) ফেব্রুয়ারিতে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে জমা দেওয়া হয়েছে। প্রকল্প সংশোধনের প্রয়োজন পড়ল কেন?

মো. নুরুল আলম: ঢাকার চারপাশের নদীতীর আরও টেকসইভাবে সুরক্ষিত করতে চলমান প্রকল্পের বাইরে অতিরিক্ত কিছু কাজ করা প্রয়োজন বলে মনে করে বিআইডব্লিউটিএ। যেমন চলমান প্রকল্পের ৪৫ কিলোমিটার স্লোপ ব্যাংক প্রটেকশনের পরিবর্তে ৩৯ কিলোমিটার কি-ওয়াল ও প্রায় ১৩ কিলোমিটার অন-পাইল ওয়াকওয়ে নির্মাণ প্রয়োজন। সদরঘাট থেকে বাবুবাজার ব্রিজ পর্যন্ত এক কিলোমিটার এলাকা পরিবেশ ও পর্যটনবান্ধব হিসেবে গড়ে তুলতে চাই আমরা। দৃষ্টিনন্দন দোকান, আধুনিক সুবিধাসংবলিত পাবলিক টয়লেটের পাশাপাশি উন্নত বিশ্বের আদলে এম্পিথিয়েটার স্থাপন করারও পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়া কামরাঙ্গীরচর থেকে খোলামোড়া পর্যন্ত এক কিলোমিটার এলাকায় পর্যটনবান্ধব পার্ক স্থাপন করে সেখানে উন্নত মানের পাবলিক টয়লেট নির্মাণের পাশাপাশি সবুজায়ন করতে চাই এলাকাটি। পার্কিং সুবিধাসহ আগত দর্শনার্থীদের জন্য বসার ব্যবস্থাও থাকবে। শিশুদের জন্য থাকবে খেলার মাঠ। নৌপথের নাব্যতা ফিরিয়ে আনতে ও দূষণমুক্ত করতে নদী খননের পাশাপাশি তলদেশে জমা বর্জ্য অপসারণ করা জরুরি। সেজন্য সদরঘাট থেকে টঙ্গী ব্রিজ পর্যন্ত নদীপথে ১ কোটি ৭০ লাখ ঘনমিটার খনন ও ৭ লাখ ঘনমিটার বর্জ্য অপসারণের পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। জরুরি এসব কাজ অন্তর্ভুক্ত করে সংশোধিত প্রকল্প প্রস্তাব (আরডিপিপি) পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। সব প্রক্রিয়া শেষ করে দ্রুত প্রস্তাবটি পাস হবে বলে আমরা আশা করছি।

প্রকল্প শেষে ঢাকার চারপাশের নদীকে আমরা কোন রূপে দেখব?

মো. নুরুল আলম: প্রথমেই যেটা বলব, তা হলো ঢাকার চারপাশের নদীগুলোর তীরভূমি স্থায়ী সুরক্ষা পাবে। বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, তুরাগ, বালু-কোনো নদীর তীরভূমিই কেউ আর দখল করতে পারবে না। এর মাধ্যমে নদী ফিরে পাবে তার চিরায়ত শাশ্বত রূপ। জনসাধারণের বিনোদনেরও ভালো সুযোগ তৈরি হবে। রক্ষা পাবে পরিবেশ-প্রতিবেশ।

অবকাঠামো নির্মাণ (তৃতীয় পর্যায়) (জুলাই ২০২১-জুন ২০২৪)' শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের পর নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রকল্পের অগ্রগতি: 'বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা ও বালু নদের তীরভূমির পিলার স্থাপন, তীররক্ষা, ওয়াকওয়ে ও জেটিসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ (দ্বিতীয় পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্পটি ২০১৮ সালের ২ জুলাই অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটির আওতায় ৫২ কিলোমিটার ওয়াকওয়ে ছাড়াও ১০ হাজার ৮২০টি সীমানা পিলার, বনায়ন, তিনটি ইকোপার্ক, ছয়টি পন্টুন, ৪০ কিলোমিটার কি-ওয়াল, ১৯টি আরসিসি জেটি, ৪০টি স্পার্ড ও ৪০৯টি বসার বেঞ্চ নির্মাণ করা হবে। ৮৪৮ কোটি ৫৫ লাখ টাকা ব্যয়সংবলিত প্রকল্পটি ২০২২ সালের জুনের মধ্যে শেষ করার লক্ষ্য ধরা হয়েছে।

ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী মোট ১৮টি প্যাকেজে প্রকল্পের কাজ চলছে। প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের কাজের দৃশ্যমান অগ্রগতিও হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের পর ৬টি লংবুম এক্সকাভেটর আগেই সংগ্রহ করা হয়েছে। এক্সকাভেটর পরিচালনার জন্য ছয়টি পন্টুন নির্মাণের কাজও শেষ হয়েছে। পূর্ত কাজের মধ্যে প্যাকেজ-১ এর অগ্রগতি হয়েছে ৮০ শতাংশ। এই প্যাকেজের অধীনে রামচন্দ্রপুর থেকে বসিলা ও রায়েরবাজার খাল থেকে কামরাঙ্গীরচর পর্যন্ত সাড়ে ৩ দশমিক ২ কিলোমিটার ওয়াকওয়ে, কিওয়াল, ওয়াকওয়ে অন পাইল স্থাপন/নির্মাণের কাজ চলছে। ৩ কিলোমিটার ওয়াকওয়ে ইতোমধ্যেই দৃশ্যমান হয়েছে।

প্যাকেজ-১৩ এর অধীনে টঙ্গী নদীবন্দর এলাকায় নির্মিত হচ্ছে ইকোপার্ক। এখন পর্যন্ত এই কাজের অগ্রগতি ৩৮ শতাংশ। প্যাকেজ-১৪ এর আওতায় চলছে ঢাকা ও টঙ্গী নদীবন্দরের অধীনে ছয়টি ভারী জেটি নির্মাণের কাজ। এসব জেটির দুটি হচ্ছে পাগলা বাজার এলাকায়। এছাড়া মুন্সিখোলা, মিরপুর সন্নিরটেক, গাবতলী ও আমিনবাজার এলাকায় নির্মিত হচ্ছে একটি করে জেটি। সাবস্ট্রাকচারের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে এবং সুপারস্ট্রাকচারের কাজ চলছে। এখন পর্যন্ত এর বাস্তব অগ্রগতি ৭৮ শতাংশ।

প্যাকেজ-১৬ এর আওতায় রয়েছে ঢাকা নদীবন্দর এলাকায় ৩ হাজার ৮৩টি সীমানা পিলার নির্মাণ। এর মধ্যে ২ হাজার ১৬৮টি পিলার ইতোমধ্যেই দৃশ্যমান হয়েছে। অবশিষ্ট ৯১৫টি পিলারের কাজও ৭৫ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে। সব মিলিয়ে প্রকল্পের এই অংশের বাস্তব অগ্রগতি ৭৬ শতাংশ।

টঙ্গী নদীবন্দর এলাকায় ২ হাজার ৬টি সীমানা পিলার নির্মাণ কাজ চলছে প্যাকেজ-১৭ এর আওতায়। এর মধ্যে ৫৬০টি পিলার ইতোমধ্যেই দৃশ্যমান হয়েছে এবং ৫৬৬টির কাজ ৪০ শতাংশ শেষ হয়েছে। এই অংশের কাজের বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ৪৫ শতাংশ।

প্যাকেজ-১৮ এর আওতায় রয়েছে নারায়ণগঞ্জ নদীবন্দরের অধীনে ২ হাজার ৪০০টি সীমানা পিলার নির্মাণ। এর মধ্যে ৪৮৩টি সীমানা পিলার দৃশ্যমান হয়েছে এবং ৯১৩টির পাইলিং শেষ হয়েছে। এ কাজের বাস্তব অগ্রগতি ৪০ শতাংশ।

পাশাপাশি রামচন্দ্রপুর থেকে বসিলা পর্যন্ত নদীর অভ্যন্তরের অননুমোদিত মাটি খননের কাজও চলমান রয়েছে। এখন পর্যন্ত এই কাজের ৬০ শতাংশ অগ্রগতি হয়েছে।

এছাড়া প্রকল্পটির অধীনে ২০১৯-২০ অর্থবছরে রামচন্দ্রপুর থেকে বসিলা ও কামরাঙ্গীরচর এলাকায় এক হাজার বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে। চলতি ২০২০-২১ অর্থবছরে তুরাগ নদীর বিরুলিয়া মৌজা থেকে রানাভোলা মৌজা পর্যন্ত প্রায় ৩০০টি, বালু নদের বড়কাউ মৌজাস্থ হরদি বাজার থেকে ভোলানাথপুর পর্যন্ত ৫৫০টি, গাবতলী দীপনগর থেকে দিয়াবাড়ী ও ঝাউচর এলাকায় বুড়িগঙ্গা ও তুরাগ নদীর তীরে ৪০০টি এবং সদরঘাট থেকে খোলামুড়া পর্যন্ত নদীর উভয় পাড়ে রোপণ করা হয়েছে আরও ৩০০টি বৃক্ষ।

৫.১. প্রকল্পের কলেবর বৃদ্ধির প্রস্তাব: চলমান প্রকল্পটিতে আরও কিছু অঙ্গ সংযুক্ত করে এর কলেবর বাড়ানোর প্রস্তাব করেছে বিআইডব্লিউটিএ। সংশোধিত প্রকল্প প্রস্তাব (আরডিপিপি) প্রণয়নের পর ২০২১ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে তা জমাও দেওয়া হয়েছে। আরডিপিপিতে প্রকল্পের নতুন ব্যয় প্রস্তাব করা হয়েছে ১ হাজার ১৮১ কোটি ১০ লাখ ৩১ হাজার টাকা। প্রকল্প সম্পন্নের মেয়াদও ২০২৩ সাল পর্যন্ত বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে।

সংশোধিত প্রকল্প প্রস্তাবে নদীর অভ্যন্তরে অননুমোদিতভাবে ভরাটকৃত ১৮ লাখ ২১ হাজার ঘনমিটার মাটি খননের পাশাপাশি তীরভূমিতে ৩৩ দশমিক ৮৬ কিলোমিটার ও তীরভূমিতে কলামের ওপর ১৭ দশমিক ৭৫ কিলোমিটার ওয়াকওয়ে নির্মাণের কথা বলা হয়েছে। অন্যান্য কাজের মধ্যে আছে ২৪ দশমিক ৬৯ কিলোমিটার তীররক্ষা কাজ, ৮০টি আরসিসি সিঁড়ি নির্মাণ, ১০ দশমিক শূন্য ৪ কিলোমিটার কি-ওয়াল নির্মাণ, ওয়াকওয়ে সংলগ্ন ৩৫ দশমিক ৩৬ কিলোমিটার ড্রেন নির্মাণ, ৩৯৫ মিটার দীর্ঘ হাঁটার সেতু নির্মাণ, ১০২ দশমিক ৫২ কিলোমিটার রেলিং নির্মাণ, ২৯১টি বসার বেঞ্চ নির্মাণ ও ৮০৫ মিটার সীমানা প্রাচীর নির্মাণ। এর বাইরে ৩ দশমিক ৫ কিলোমিটার পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা, ভারী যানবাহনের জন্য ১৪টি জেটি, জেটির জন্য ৯ হাজার বর্গকিলোমিটার রাস্তা, ২৩ হাজার বর্গমিটার আরসিসি পার্কিং ইয়ার্ড, উঁচু ভূমিতে ৩ হাজার ৭১২টি ও নিচু ভূমিতে ৩ হাজার ৮৫০টি সীমানা পিলার, নদীর তীরভূমিতে ৯ হাজার ৪২ বর্গকিলোমিটার আয়তনের তিনটি ইকোপার্ক, সদরঘাট ও কেরানীগঞ্জ এলাকায় যাত্রীসেবায় ৪টি ঘাট নির্মাণের প্রস্তাবও করা হয়েছে আরডিপিপিতে।

জনসচেতনতায় জোর

নদী দখল ও দূষণ রোধ একক কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন ব্যাপক পরিসরে জনসচেতনতা। এর অংশ হিসেবে হাটবাজারের কঠিন বর্জ্য, গৃহস্থালির আবর্জনা এবং হাসপাতাল ও কল-কারখানার বর্জ্য নদীতে না ফেলতে স্থানীয় জনগণকে সচেতন করার চেষ্টা করছে বিআইডব্লিউটিএ। পাশাপাশি সার্কুলার ওয়াটার ওয়েজের বিভিন্ন স্থানে অংশীজনদের সাথে আলোচনা সভার মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যেও কাজ করছে সংস্থাটি।

দখল ও দূষণরোধকল্পে বিআইডব্লিউটিএ জনসচেতনতামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে এবং অব্যাহতভাবে সেগুলো চলছে। জনসচেতনতামূলক এসব কার্যক্রমের মধ্যে আছে, গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মানববন্ধন; বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, বালু ও তুরাগপাড়ে বাউল ও জারি গান এবং গণসংগীতের আয়োজন; নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে দখল-দূষণের বিরুদ্ধে র‍্যালি; দর্শনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন স্থানে ব্যানার, ফেস্টুন ও পোস্টার টাঙানো; নদী দখল ও দূষণ রোধ সম্পর্কিত লিফলেট ও স্টিকার বিলি; জনসচেতনতামূলক পথনাটিকা প্রদর্শন; দখল-দূষণের বিরুদ্ধে টেলিযোগাযোগ এবং তথ্য মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় মোবাইল ফোনের মাধ্যমে এসএমএস প্রেরণ; বহুল প্রচারিত ১০টি জাতীয় দৈনিকে নদী দখল ও দূষণ রোধ-সংক্রান্ত গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ এবং গণবিজ্ঞপ্তি বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, বালু ও তুরাগ নদের তীরে বসবাসরত জনসাধারণের মধ্যে লিফলেট আকারে বিলি করা।

আরডিপিপি (প্রস্তাবিত)
প্রকল্প ব্যয় ১১৮১১০.৩১ লক্ষ টাকা

প্রধান প্রধান অঙ্গের নাম	পরিমাণ
নদীর অভ্যন্তরের অননুমোদিত ভরাটকৃত মাটি খনন	১৮,২১,০০০ ঘনমি.
নদীর তীর ভূমিতে ওয়াকওয়ে নির্মাণ	৩৩৮৫৮ মি.
নদীর তীরভূমিতে কলামের উপর ওয়াকওয়ে নির্মাণ	১৭৭৫০ মি.
তীররক্ষা কাজ	২৪৬৮৫ মি.
আরসিসি সিঁড়ি নির্মাণ	৮০ টি
কি ওয়াল নির্মাণ	১০০৪৩ মি.
ওয়াকওয়ে সংলগ্ন ড্রেন নির্মাণ	৩৫৩৫৮ মি.
Boulder Protection for Scour-	২৬৫০ মি.
পায়ে হাঁটার সেতু নির্মাণ	৩৯৫ মি.
রেলিং নির্মাণ	১০২,৫২৪ মি.
বসার বেঞ্চ নির্মাণ	২৯১ টি
সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	৮৫০ মি.
পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণ	৩৫০০ মি.
ভারী যানবাহনের জন্য জেটি নির্মাণ	১৪ টি
জেটির জন্য রাস্তা নির্মাণ	৯০০০ বর্গমি.
RCC Parking Yard Construction	২৩০০০ বর্গমি.
উঁচু ভূমিতে নদীর সীমানা পিলার নির্মাণ	৩৭১২ টি
নীচু ভূমিতে নদীর সীমানা পিলার নির্মাণ	৩৮৫০ টি
নদীর তীরভূমিতে ইকোপার্ক নির্মাণ	০৩ টি (৯০৪২ বর্গমি.)
সদরঘাট ও কেরানীগঞ্জ এলাকায় যাত্রী সেবার জন্য ঘাট নির্মাণ	০৪ টি
বনায়ন	থোক

শেষ কথা

নদী সুন্দর, সুন্দরের নির্মাতা, জীবনদায়ী। ঢাকার চারপাশের নদীগুলো আমাদের শিল্প ও অর্থনীতির শক্তি, পরিবহনের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারেও নদী ঘিরে ও নদীরক্ষায় বিশেষ উদ্যোগের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। তবে নদীকে বাঁচিয়ে রাখার কাজ সরকারের একার নয়; এ দায়িত্ব সকলের। এজন্য সবার আগে নদীর পার্শ্ববর্তী শিল্পকারখানার বর্জ্য পরিশোধন করতে হবে। তারপর নদীতে ফেলতে হবে। নদীর তীরবর্তী হাটবাজার ও গৃহস্থালির বর্জ্য ফেলাও বন্ধ করতে হবে। এ লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় বা স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় থেকে জোনভিত্তিক ইটিপি স্থাপন করে শিল্প বর্জ্য ও ড্রেনেজ খালের বর্জ্য পরিশোধনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এসব হলে ধনপতির মতো আমরাও বলতে পারব–যেদিকে চোখ যায় যেন জেগে থাকে নদীকূল, নদীগর্ভ, নদীকান্ত, নদীতট, নদীপথ।

স্বাধীনতার ৫০ বছরে বিআইডব্লিউটিএ'র অর্জন»

জিনারুল ইসলাম

এই অঞ্চলের নদীপথে যন্ত্রচালিত নৌযানের যাত্রা প্রায় দুই শতক আগে, ১৮৩৪ সালে। বছর দশেক পর ১৮৪৪ সালে গঠিত হয় দ্য ইন্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন অ্যান্ড রেলওয়ে কোম্পানি লিমিটেড (আইজিএনআর)। এর কয়েক বছর পর আসে আরও একটি কোম্পানি রিভার স্টিম নেভিগেশন কোম্পানি লিমিটেড (আরএসএন)। উনিশ শতক পর্যন্ত বাংলা, আসাম ও বিহারে নৌপথে বাণিজ্য এই দুই কোম্পানিই নিয়ন্ত্রণ করত। মোট যাত্রী ও কার্গো পরিবহনের ৭০ শতাংশই করত তারা।

ব্রিটিশ আমলে নৌপথের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও ছিল তাদেরই। নৌপথ রক্ষণাবেক্ষণে বা নিয়ন্ত্রণে সরকারের কোনো ভূমিকা তখন ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই বেসরকারি কোম্পানিগুলোর মাধ্যমে নৌপথের যে উন্নতি ও উন্নয়ন তা ছিল তাদের মুনাফাকেন্দ্রিক। এই নীতির কারণে মাদারীপুর বিল রুট বাদ দিলে বিশ শতকের গোড়ার দিকেও এই অঞ্চলের নৌপথের উন্নয়ন সেভাবে চোখে পড়েনি। ১৯০৭ সালে কেনা ফয়ার ড্রেজার দিয়ে কেবল মধুমতী নদী, মাদারীপুর বিল রুট এবং লোয়ার কুমার ও গোপালগঞ্জের লুপ খনন করা হয়েছিল। পরের দিকে কেনা হয়েছিল আলেক্সান্দ্রা নামে আরও একটি ড্রেজার।

'লর্ড উইলিয়াম বেনটিক' নামে ইঞ্জিনচালিত প্রথম নৌযানটি ভাসানোর পর সুন্দরবন চ্যানেল দিয়ে কলকাতা ও খুলনার মধ্যে প্রতি বছর বিপুল সংখ্যক নৌযান চলাচল করলেও নৌপথের জন্য পৃথক কোনো কর্তৃপক্ষ গঠন করা যায়নি দীর্ঘ সময়েও। এমনকি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রথম এক দশকও অভ্যন্তরীণ নৌপথ পরিচালিত হয়েছে পৃথক কোনো কর্তৃপক্ষ ছাড়াই। অথচ একুশ শতকের প্রথম প্রান্তিকেই সুন্দরবন দিয়ে কলকাতা-খুলনা রুটে চলাচলকারী নৌযানের সংখ্যা পৌঁছে গিয়েছিল বার্ষিক গড়ে ৪ হাজার ৮৩০।

বিআইডব্লিউটিএ প্রতিষ্ঠার পূর্বাপর

নৌযান চলাচল বাড়তে থাকায় এই অঞ্চলের অভ্যন্তরীণ নৌপথের জন্য আলাদা একটি বোর্ড গঠনের প্রক্রিয়া অবশ্য শুরু হয় তিরিশের দশকেই। সেই লক্ষ্যে ১৯৩৪ সালে বেঙ্গল আইনসভা 'দি ইনল্যান্ড ওয়াটারওয়েজ বিল'ও পাস করে। কিন্তু সেটি আর কাজে আসেনি। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের অব্যবহিত পরপরই অভ্যন্তরীণ নৌপথ ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও উন্নয়নে বিভিন্ন সংস্থা, কমিটি ও বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে উপযুক্ত একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার দাবি উঠতে থাকে।

এই অঞ্চলের অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহনের জন্য সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রথম সুপারিশ আমরা দেখতে পাই ১৯৪৮ সালের ইউনাইটেড স্টেটস সার্ভে মিশনে। ১৯৫১ সালে জাতিসংঘের আইডব্লিউটি স্টাডি গ্রুপেও একই প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়। ১৯৫৩ সালে জে জি সুরি ভারত ও পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহনের ওপর জাতিসংঘের জন্য একটি প্রতিবেদন তৈরি করেন। ওই প্রতিবেদনেও আলাদা কর্তৃপক্ষের বিষয়টি উঠে আসে। অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন নিয়ে ১৯৫২ ও ১৯৫৬ সালে পূর্ব পাকিস্তানে দুই দফা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে খাতটির ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও উন্নয়নে পৃথক কর্তৃপক্ষ গঠনের দাবি আবারও উচ্চারিত হয়। ১৯৫৫-৫৬ সালে তৎকালীন পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকার একটি অ্যাডহক কমিটি গঠন করে। একই বছর পূর্ব পাকিস্তানের পানিসম্পদ নিয়ে জাতিসংঘের জন্য একটি প্রতিবেদন তৈরি করেন জে জে ক্রুগ। অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন খাতের জন্য কর্তৃপক্ষের বিষয়টি উঠে আসে সেখানেও। একই সুপারিশ করা হয় ১৯৫৭ সালে বিশ্বব্যাংকের সার্ভে মিশন, আইসিএ সার্ভে মিশন ও পাকিস্তান সরকারের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে। সর্বশেষ ১৯৫৮ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের যে আইডব্লিউটি ইকুইটি কমিটি, সেখানেও কর্তৃপক্ষ গঠনের বিষয়টি আসে জোরেশোরেই।

দীর্ঘ সময় ধরে চলা এসব সুপারিশ ও দাবির পরিপ্রেক্ষিতে এই অঞ্চলের অভ্যন্তরীণ নৌপথের জন্য পৃথক একটি কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃতি পায়। এরপর ১৯৫৮ সালের ৩১ অক্টোবর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকার অভ্যন্তরীণ নৌপথের উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং নৌযান চলাচলে শৃঙ্খলা আনতে ও সুনির্দিষ্ট কিছু নাব্য নৌপথের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দি ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট অথরিটি অর্ডিন্যান্স, ১৯৫৮ (ইস্ট পাকিস্তান) জারি করে। ওই বছরের ৪ নভেম্বর চেয়ারম্যান হিসেবে মাসুদ হোসেন ও সদস্য (প্রকৌশল) হিসেবে বিএম আব্বাসকে নিয়োগদানের মধ্য দিয়ে গঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (ইপিআইডব্লিউটিএ)। কর্তৃপক্ষের প্রথম চেয়ারম্যান হিসেবে ১৯৫৮ সালের ১৮ নভেম্বর মাসুদ হোসেন দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। স্বাধীনতার পর ১৯৭৭ সালে অধ্যাদেশে সংশোধনী এনে ইস্ট পাকিস্তান বা পূর্ব পাকিস্তান শব্দগুচ্ছটি বাদ দেওয়া হয়।

কার্যপরিধি

কর্তৃপক্ষের কার্যপরিধি কী হবে অধ্যাদেশেই তা নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে। অধ্যাদেশটিতে প্রথম সংশোধনী আনা হয় ১৯৭৭ সালে। এরপর ১৯৯৭ সালে অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (সংশোধনী) আইন নামে আরেকটি সংশোধনী আনা হয়। এসব সংশোধনীর মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের কার্যপরিধি আরও সুনির্দিষ্ট ও বিস্তৃত হয়েছে। কর্তৃপক্ষের এখতিয়ারের মধ্যে পড়ে যেসব কার্যক্রম তা হলো:

- নৌপথ নাব্য রাখার উদ্দেশ্যে নদী শাসনসহ নদী সংরক্ষণ এবং নৌ চলাচলে সহায়তা যেমন মার্কা, বয়াবাতি, বিকন বাতিসহ নৌ-সহায়ক সামগ্রী স্থাপন;
- নাব্যতা ও আবহাওয়া-সংক্রান্ত তথ্য প্রচার করা
- পাইলটেজ সুবিধা প্রদান ও হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ পরিচালনা করা;
- ড্রেজিংয়ের প্রয়োজন হলে সে সম্পর্কিত কর্মসূচি তৈরি ও বিদ্যমান নাব্য নৌপথগুলো দক্ষতার সাথে সংরক্ষণ করা। নৌ চলাচলের জন্য নতুন চ্যানেল ও ক্যানেল উন্নয়নের পাশাপাশি মরে যাওয়া বা শুকিয়ে যাওয়া নদী, চ্যানেল ও ক্যানেল পুনরুজ্জীবিত করা;
- নদীবন্দর, ঘাট এবং এসব নদীবন্দর ও ঘাটের টার্মিনাল সুবিধাদির উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও পরিচালনা করা
- নাব্য নৌপথে কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকলে তা অপসারণ করা;
- প্রধান নদী, ফিডার ও ক্রিক রুটে যাত্রী এবং কার্গো পরিবহন নির্বিঘ্ন করতে ট্রাফিক জরিপ পরিচালনা করা;
- যন্ত্রচালিত নৌযানে স্বাচ্ছন্দ্যে, নিরাপদে ও দ্রুত যাত্রী পরিবহনের লক্ষ্যে সাশ্রয়ী নৌ যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলো;
- সরকারের পক্ষ থেকে অভ্যন্তরীণ নৌপথে যাত্রী ও কার্গো পরিবহনের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন ভাড়া নির্ধারণ করা;
- যাত্রীবাহী নৌযানের টাইম-টেবিল অনুমোদন করা;

» ১৯৫৮ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের দি ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট অথরিটি অর্ডিন্যান্সের আওতায় প্রতিষ্ঠিত হয় ইপিআইডব্লিউটিএ

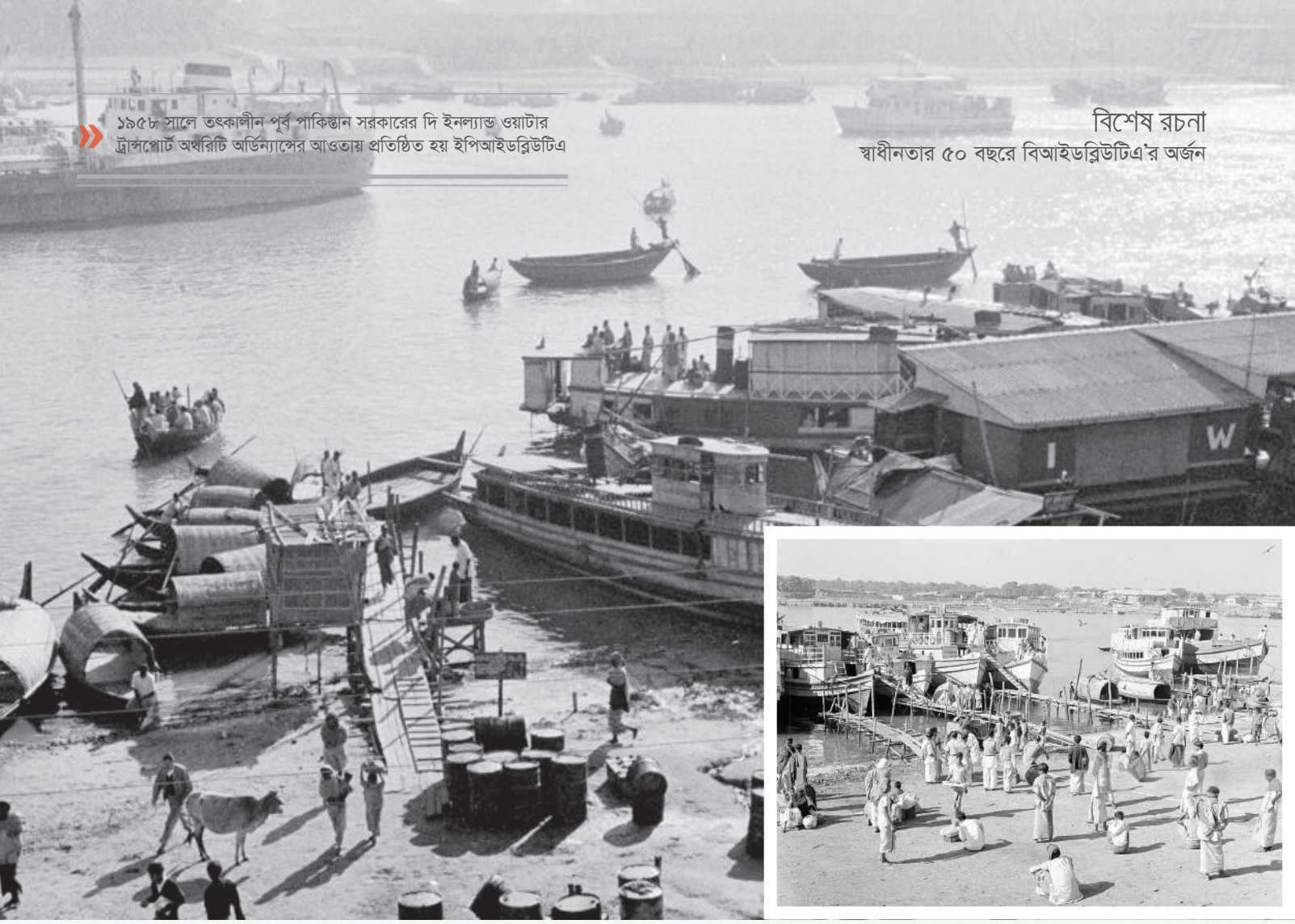

নারায়ণগঞ্জ বাংলাদেশের ঐতিহাসিক ও পুরনো নদীবন্দরগুলোর অন্যতম। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭২ সালের ১৮ মার্চ শীতলক্ষ্যায় নৌবিহারে বেরিয়ে ঐতিহ্যবাহী নদীবন্দরটিতে আগমন করেন। ১৯৬৭ সালের দিকে সমুদ্রগামী জাহাজ থেকে সাম্পানে করে নারায়ণগঞ্জ নদীবন্দরে কার্গো আনার দৃশ্য। (ইনসেটে) দেশের আরেক গুরুত্বপূর্ণ নদীবন্দর ঢাকা নদীবন্দর বা সদরঘাটে ১৯৬৭ সালে নৌ-টার্মিনাল নির্মাণ করে অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ। তার আগে ১৯৬০ সালে ব্যস্ত সদরঘাটের দৃশ্য ■ ছবি: জাতিসংঘ ও গেটি ইমেজ

- দেশীয় জলযানগুলোর আধুনিকায়ন ও যান্ত্রিকীরণের কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামীণ পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা;
- বাণিজ্য ও কৃষির স্বার্থে বিদ্যমান পরিবহন সক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহারে অন্যান্য পরিবহন মাধ্যম, সমুদ্র বন্দরের সাথে অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহনের সমন্বয় সাধন করা;
- জলযানের নকশা, টাওয়েজ কৌশল, ল্যান্ডিং ও টার্মিনাল সুবিধাদি ও বন্দর স্থাপনার উন্নয়নসহ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন-সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে গবেষণা পরিচালনা করা;
- দেশের ভেতর ও বাইরে অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহনসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কারিগরি প্রশিক্ষণের জন্য কর্মসূচির ব্যবস্থা করা;
- অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন বহরে থাকা জলযান মেরামত ও নতুন জলযান নির্মাণের লক্ষ্যে শিপইয়ার্ড ও জাহাজ মেরামত শিল্পের সাথে লিয়াজোঁ রক্ষা করা;
- অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন শিল্পের জন্য মেরামত সরঞ্জাম আমদানিকে সহজীকরণ করা;
- উপরোক্ত কার্যক্রমগুলো সম্পাদনের জন্য পরিকল্পনা বা উন্নয়ন কর্মসূচি প্রস্তুত করা;
- এর বাইরে সময় সময় সরকার নির্দেশিত যেকোনো কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;

স্বাধীনতা-পূর্ব কার্যক্রম

পরিবহনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে ওঠার সব সম্ভাবনা থাকার পরও স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী সময়ে দশকের পর দশক ধরে অবহেলিত থেকে গেছে এই অঞ্চলের অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন ব্যবস্থা। খাতটি পুরোপুরি বেসরকারি খাতের নিয়ন্ত্রণে থাকাই এর প্রধানতম কারণ। পরিবহনের অন্যান্য মাধ্যম যেমন সড়ক, রেল ও আকাশপথে সরকারের নিয়ন্ত্রণ থাকলেও ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন খাত ছিল ঠিক এর বিপরীত। এর আরেকটি কারণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে পাকিস্তান ইকোনমিক সার্ভে ১৯৬০-৬১-তে। সেটা হলো নৌপথের নাব্যতা ও নৌযান পরিচালনার কর্তৃত্ব আলাদা করে রাখা এবং এটাকেই অভ্যন্তরীণ নৌপথের অনুন্নয়নের পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে। এই অসামঞ্জস্য দূর করতেই ১৯৫৮ সালের নভেম্বরে অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ গঠন করে সরকার।

কর্তৃপক্ষ গঠনের পরও যে নৌপথের খুব দ্রুত উন্নতি হয়েছে তেমনটা বলা যায় না। কারণ প্রকৌশলগত বা পরিসংখ্যানগত উপাত্তের ভিত্তিতে উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হলেও কর্তৃপক্ষ কাজ শুরু করেছিল এ ধরনের কোনো তথ্য-উপাত্ত ছাড়াই। দক্ষ জনবলের সংকটও ছিল প্রকট। নৌপথ, বন্দর, সংরক্ষণ, পাইলটেজ, মেরিন, ট্রাফিক ও সংশ্লিষ্ট অপরাপর বিভাগগুলো দেখভালেই কারিগরিভাবে প্রশিক্ষিত কর্মকর্তার প্রচণ্ড অভাব ছিল। স্বাভাবিকভাবেই প্রতিষ্ঠার প্রথম দেড় বছরে অর্থনীতিতে উল্লেখ করার মতো বাড়তি কিছু যোগ করতে পারেনি কর্তৃপক্ষ।

অথচ সেই সময়েও পূর্ব পাকিস্তানে নাব্য নৌপথ ছিল ২ হাজার ৭০০ মাইল, বর্ষা মৌসুমে যা ৪ হাজার মাইল পর্যন্ত উন্নীত হতো। পাকিস্তান ইকোনমিক সার্ভে ১৯৬০-৬১ এর তথ্য অনুযায়ী, বিস্তৃত এই নৌপথে চলাচল করত ১৭৭টি স্টিমার, ৭৪৭টি মোটরভেসেল, ৪৫৮টি যাত্রীবাহী লঞ্চ ও ৬৯৬টি ডাম্ব ক্রাফট। সবমিলিয়ে এসব নৌযানের যাত্রী পরিবহনের ক্ষমতা ছিল ৯২ হাজার ৫৩ ও কার্গো পরিবহন ক্ষমতা ১ লাখ ৫৪ হাজার মেট্রিক টন। ২৭০টি প্রতিষ্ঠান এসব নৌযান পরিচালনা করত। পাশাপাশি চলাচল করত ৩ লাখ দেশীয় নৌকা, যেগুলোর ১৪ লাখ যাত্রী ও ১২ লাখ মেট্রিক টন কার্গো পরিবহনের সক্ষমতা ছিল।

বিস্তৃত এই নৌপথ ও বিপুল সংখ্যক নৌযানকে কাজে লাগিয়ে অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রয়াস জোরেশোরে শুরু করে ১৯৬০ সালে। পাকিস্তানের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (১৯৬০-৬৫) আওতায় ২৩ কোটি রুপির কর্মসূচি হাতে নেয়। প্রকৌশলগত ও মাঠ জরিপকারীদের মাধ্যমে সম্ভাব্যতা সমীক্ষার কাজও এই সময়ে সম্পাদন করা হয়।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে সাকল্যে চারটি প্রকল্প সম্পাদন করে অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ। ১৯৬১ সালের জুনে সমাপ্ত একটি প্রকল্পের আওতায়

চারটি ফেরি ক্রয় করে অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ। পরবর্তীতে সেগুলো বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন করপোরেশনের (বিআইডব্লিউটিসি) কাছে হস্তান্তর করা হয়। পরের বছর কেনা হয় ছয়টি জরিপ ও পরিদর্শন জাহাজ। রাত-দিন সবসময় নৌপথে যাতে নিরাপদে নৌযান চলাচল করতে পারে, সেজন্য ১৯৬৪ সালে বয়া, বিকন, মার্ক সংগ্রহ ও সেগুলো স্থাপন করা হয়। এছাড়া কর্তৃপক্ষের নৌযান মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ১৯৬৫ সালে বরিশালে স্থাপন করা হয় একটি ওয়ার্কশপ।

তবে ১৯৬৫ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে কর্তৃপক্ষের কার্যক্রমে অনেকটাই গতি আসে। দেশের প্রধান পাঁচটি নদীবন্দর ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর, বরিশাল ও খুলনায় কার্গো জেটি ও প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল উন্নয়ন করা হয়। উপকূলীয় দ্বীপগুলোতে ১৭টি টিম্বার জেটি ও ছোট রিভার স্টেশনগুলোতে ১৮টি ভাসমান পন্টুন নির্মাণ করা হয়। বরিশাল রিপেয়ার ওয়ার্কশপেও শুরু হয় সব ধরনের ও আকারের নৌযানের মেরামত কার্যক্রম। ১৯৬৫ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে ২০০টি লঞ্চ ল্যান্ডিং স্টেশন নির্মাণের কথা থাকলেও ১১৪টির নির্মাণ সম্পন্ন হয়। তিনটি ড্রেজার ক্রয়েরও লক্ষ্যমাত্রা ছিল এই সময়ে। যদিও ওই সময়ের মধ্যে তা কেনা যায়নি।

পাকিস্তান ইকোনমিক সার্ভে ১৯৬৯-৭০ এর তথ্য অনুযায়ী, সরকারি খাতে এই সময়ে ২৭ কোটি ৪৭ লাখ রুপি ব্যয়ের পরিকল্পনা থাকলেও খরচ হয় ১১ কোটি ৫০ লাখ রুপি। একই সময়ে বেসরকারি খাতে পরিকল্পিত ৬৫ কোটি ৫০ লাখ রুপির বিপরীতে বিনিয়োগ হয় ৭ কোটি রুপি।

সবমিলিয়ে ১৯৬৫-৭০ মেয়াদে অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষের সামগ্রিক অর্জন ছিল এই রকম:

কাজের ধরন	১৯৬৫ সালের অবস্থা	১৯৭০ সালের অবস্থা
যন্ত্রচালিত নৌযান	১,৩২২ টি	১,৫৪৪ টি
ডাম্ব ক্রাফট	৮৩২ টি	৯৩৭ টি
নৌপথ	৪,৯৮৪ মাইল	৪,৯৯৫ মাইল
নৌযান নির্মাণের ইয়াড	৬২ টি	৬২টি
আইডব্লিউটি অপারেটর	৪২৬ টি	৬২৩ টি
আইডব্লিউটি রুট	২৬১ টি	২৬১ টি
স্টেশন	১,৪০৭টি	১,৪০৭ টি
কার্গো পরিবহন ক্ষমতা	২,১২,০০০ টন	২,৫৬,০০০ টন
যাত্রী পরিবহন ক্ষমতা	১,০৭,০০০	১,১৫,০০০
ভাসমান পন্টুন	----	১০০ টি
ফেরি	----	১২ টি
হোভারমেরিন	----	১ টি
এলসিটি ভেসেল	----	৪ টি
উপকূলীয় জাহাজ	----	৪ টি
মোটর বোট	----	১০ টি
মেজর পোর্ট	----	৫ টি
ভাসমান ডক	----	১ টন
উদ্ধারকারী জাহাজ	----	১ টি
ফেরি টার্মিনাল	----	১৪ টি
ঢাকা চেইন সিস্টেম	----	১ টি

সূত্র: পাকিস্তান ইকোনমিক সার্ভে ১৯৬৯-৭০

দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৬ সালের ২৭ অক্টোবর মোংলা-ঘষিয়াখালী চ্যানেল নৌ চলাচলের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মুক্ত ঘোষণা করেন ■ ছবি: বিআইডব্লিউটিএ

স্বাধীনতা-পরবর্তী অর্জন

উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষকে স্বাধীনতার পর নতুন করে ঢেলে সাজানোর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। বলা যায় নতুন করে শুরু করতে হয়। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ ১৯৭২ সালের সেপ্টেম্বরে কর্তৃপক্ষের প্রথম চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পান ক্যাপ্টেন নুরুল হক। এক বছর পর্যন্ত তার এ নিয়োগ ছিল খণ্ডকালীন। পূর্ণকালীন চেয়ারম্যান হিসেবে ক্যাপ্টেন হক নিয়োগ পান ১৯৭৩ সালের নভেম্বরে। ১৯৭৭ সালের জুলাই পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্ব পালন করেন।

স্বাধীনতার কিছুদিন পরই ১৯৭২ সালের ১৮ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে সাথে নিয়ে অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষের জাহাজ 'ইনভেস্টিগেটরে' করে শীতলক্ষ্যায় নৌবিহারে বেরিয়েছিলেন। ওই সময় তিনি নারায়ণগঞ্জ নদীবন্দরে গিয়েছিলেন। প্রায় ৬ ঘণ্টার নৌবিহারে তারা নদীমাতৃক বাংলার অপরূপ দৃশ্য উপভোগ করেছিলেন।

স্বাধীনতা-পরবর্তী ১৯৭৮ পর্যন্ত কার্যক্রম:

যুদ্ধকালীন তো বটেই, যুদ্ধ-পরবর্তী সময়েও যোগাযোগের প্রধানতম মাধ্যম ছিল অভ্যন্তরীণ নৌপথ। কারণ, মুক্তিযুদ্ধের সময় সড়ক ও রেলপথের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। ২৯৯টি রেল সেতু ও ২৭৪টি সড়ক সেতু ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যেগুলো মেরামতের পর চালু করতে অনেকটা সময় লেগে যায়। রেল ও সড়কের তুলনায় অভ্যন্তরীণ নৌপথ অবকাঠামোয় অপেক্ষাকৃত কম বিনিয়োগের দরকার পড়ায় সেদিকেই বেশি মনোযোগ দেওয়ার কথা বলা হয় ১৯৭৩-৭৮ মেয়াদি প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে। নৌপথ ঘিরে বেশকিছু বড় ধরনের কর্মসূচি প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যেগুলো সম্পাদনের দায়িত্ব পড়ে অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষের ওপর। কর্মসূচিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

- মোংলা-ঘষিয়াখালী চ্যানেল চালুকরণ;
- ৫০০ মাইল নৌপথ উন্নয়ন;
- ১,০০০ মাইল নৌপথের জরিপ ও সংরক্ষণ;
- প্রধান প্রধান নদীবন্দরগুলোতে ডিসচার্জ পয়েন্ট বাড়ানোর পাশাপাশি দক্ষ লোডিং ও আনলোডিং ব্যবস্থা এবং কিছু ট্রানজিট শেড নির্মাণ;
- নতুন নদীবন্দর নির্মাণ;
- গৃহীত পরীক্ষামূলক প্রকল্পের ভিত্তিতে ফেরো-সিমেন্ট নৌযান/পন্টুন নির্মাণসহ দেড় হাজার দেশীয় নৌকার যান্ত্রিকীকরণ;
- ১০টি ড্রেজার ক্রয় ও
- কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

এছাড়া বিভিন্ন স্থানে নৌপথ ও নদীবন্দর উন্নয়নে সমন্বিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনার কথা বলা হয় প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে। অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক হওয়ায় শুকিয়ে ও মরে যাওয়া এমন নদী পুনরুদ্ধারে বিস্তারিত গবেষণার সুপারিশও করা হয় সেই সময়। স্বাধীনতার পর ভারতের সাথে নতুন ধরনের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার সম্ভাবনার কথা বিবেচনায় নিয়ে জোর দেওয়া হয় নতুন নতুন নদীবন্দর নির্মাণের ওপর।

এই সময়েই উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য কয়েক দফায় বিভিন্ন নদীর মৌলিক হাইড্রোগ্রাফিক ডাটা সংগ্রহ করে বিআইডব্লিউটিএ। বিভিন্ন নদীর খননকাজও করা হয়। ডেককর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য বিআইডব্লিউটিএ'র অধীনে নারায়ণগঞ্জে ডেক অ্যান্ড ইঞ্জিন পার্সোনেল ট্রেইনিং সেন্টারও (ডিইপিটিসি) প্রতিষ্ঠিত হয় এই সময়ে।

১৯৮০-৮৫: আশির দশকেও বাংলাদেশের পণ্য ও যাত্রী পরিবহনে অভ্যন্তরীণ নৌপথের গুরুত্ব কমেনি। তখনো মোট কার্গো পরিবহনের ৫০ শতাংশ এবং যাত্রী পরিবহনের ২৫ শতাংশ হতো নৌপথে। পণ্য ও যাত্রী পরিবহনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেও নৌপথগুলোর নাব্যতা কমে আসতে থাকে ধারাবাহিকভাবে। নদী ও চ্যানেলগুলোয় পলি জমে তিন দশকের মধ্যে সাড়ে ৪ হাজার মাইল দীর্ঘ নৌপথ কমে দাঁড়ায় ৩ হাজার মাইলে। সেচের কাজে অত্যধিক মাত্রায় ভূ-উপরস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন পরিস্থিতি আরও নাজুক করে তোলে। নৌপথের গভীরতা কমে যাওয়ার পাশপাশি নৌপথগুলোর ব্যবস্থাপনাগত সমস্যাও ছিল। রাত্রিকালে নির্বিঘ্নে নৌযান চলাচলের জন্য মার্কিংয়ের অভাব ছিল। চলাচলকারী নৌযানগুলোও পুরনো হয়ে গিয়েছিল। ল্যান্ডিং সুবিধাও পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল না।

এসব বিবেচনায় দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ড্রেজিং ও মার্কিংয়ের মাধ্যমে চ্যানেলগুলোর উন্নয়ন, ল্যান্ডিং সুবিধা বৃদ্ধি ও নৌযানের সংখ্যা বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। নদীগুলোর শুকিয়ে যাওয়া ছয়টি সেকশনে ১ কোটি ২০ লাখ কিউবিক ইয়ার্ড খনন, নৌযান চলাচলকারী তিনটি চ্যানেল খনন, আরও চারটি নদীবন্দর ও ৫০টি ল্যান্ডিং স্টেশন নির্মাণ এবং ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় দ্রুত চলাচল উপযোগী এলসিটি (ল্যান্ডিং ক্রাফট ট্রান্সপোর্ট) ভেসেল ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় পরিকল্পনায়। আর ল্যান্ডিং স্টেশনগুলো টোল ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যবস্থাপনার কথা বলা হয়।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদকালে বিআইডব্লিউটিএ পাবনার বাঘাবাড়িতে নদীবন্দর নির্মাণের কাজ শেষ করে। পাশাপাশি খাদ্যশস্য খালাসের জন্য ইকরামপুর, খানপুর ও মহেশ্বরপাশায় আরসিসি জেটি নির্মাণ করে কর্তৃপক্ষ। বাড়তি নৌ চলাচলের ব্যবস্থা করে ঢাকা নদীবন্দর সম্প্রসারণ, গ্রামাঞ্চলে ল্যান্ডিং স্টেশন নির্মাণ, আরিচা, নগরবাড়ী, সিরাজগঞ্জ ও ভুঞাপুরে ফেরি টার্মিনালও নির্মাণ করা হয় এই সময়ে। একই সাথে সুরমা, বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা ও তিতাস নদী খননের পাশাপাশি হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ জাহাজ ও নেভিগেশনাল যন্ত্রপাতিও কেনা হয়। ১৯৮৩ সালে সংগ্রহ করা হয় উদ্ধারকারী জাহাজ 'রুস্তম'। আরেকটি উদ্ধারকারী জাহাজ 'হামজা' সংগ্রহ করা হয় ১৯৬৮ সালে।

অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন বহু আগে থেকেই ছিল বেসরকারি খাতের ওপর নির্ভরশীল। আগামীতে যে এটা অনেক বাড়বে সেটা ধরেই নেওয়া হয়। এটা বিবেচনায় নিয়ে বিআইডব্লিউটিএ নিয়ন্ত্রণমূলক কর্মকাণ্ডে মনোযোগ বাড়ায়, যাতে করে যাত্রী পারাপার নিরাপদ ও আরামদায়ক হয়। পাশাপাশি নৌ চ্যানেল ও ল্যান্ডিং স্টেশনগুলোর উন্নয়নেও জোর দেয় কর্তৃপক্ষ।

অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন খাতে সরকারের এই নীতির কারণে স্বাভাবিকভাবেই বেসরকারি মালিকানায় নৌযান পরিচালনা এবং যাত্রী ও কার্গো পরিবহন বাড়তে থাকে। ১৯৭৯-৮০ সালে যন্ত্রচালিত নৌযানের ৭৫ শতাংশ বেসরকারি মালিকানায় পরিচালিত হলেও

বঙ্গবন্ধুর সংগৃহীত ড্রেজার ডেল্টা-২ (বামে) এখনও সচল রয়েছে। (ডানে) বিআইডব্লিউটিএ'র বহরে নতুন সংযোজিত এক্সিবিয়ান ড্রেজার ■ ছবি: বিআইডব্লিউটিএ

১৯৮৪-৮৫ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৮৪ শতাংশে। ১৯৭৯-৮০ সালে বেসরকারি মালিকানায় দেড় লাখ দেশীয় নৌকা অভ্যন্তরীণ নৌপথে চলাচল করত। ১৯৮৪-৮৫ সালে তা বেড়ে হয় ২ লাখ। যন্ত্রচালিত নৌযানে ব্যাপক পরিমাণে বিনিয়োগেও এগিয়ে আসেন বেসরকারি উদ্যোক্তারা। ১৯৭২ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত এ খাতে বেসরকারি বিনিয়োগ ছিল ১১৪ কোটি ২৪ লাখ টাকা। ১৯৮০ থেকে ১৯৮৫ সালের মধ্যে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৩৯১ কোটি টাকায়।

বেসরকারি খাতকে এগিয়ে নেওয়ার এই নীতির কারণে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন করপোরেশনের (বিআইডব্লিউটিসি) সম্প্রসারণ থেকে সরে আসে সরকার। ফলে ১৯৮০ সালের দিকেও করপোরেশনের মালিকানাধীন বিভিন্ন ধরনের ৬০০টি নৌযান থাকলেও ১৯৮৫ সালের দিকে তা ৫৩৩টিতে নেমে আসে। সংস্থাটির মালিকানাধীন নৌযানের মাধ্যমে ১৯৭৯-৮০ সালে ২০ লাখ টন কার্গো পরিবহন হলেও ১৯৮৪-৮৫ সালে তা ১৩ লাখ টনে নেমে আসে।

১৯৮৫-৯০: এই সময়কালে নৌযানের সংখ্যা ও পরিসর বাড়লেও নৌপথ সংকোচনের ধারা অব্যাহত থাকে। তারপরও অভ্যন্তরীণ নৌপথই ছিল যাত্রী পরিবহনের প্রধানতম মাধ্যম। অন্য যেকোনো মাধ্যমের চেয়ে নৌপথেই সবচেয়ে বেশি যাত্রী পরিবহন হতো। ১৯৮৮ সালের ভয়াবহ বন্যায় দেশের তিন-চতুর্থাংশ প্লাবিত হলে পরিবহন মাধ্যম হিসেবে বিশেষ করে বন্যার সময় নৌপথের গুরুত্ব নতুন করে সামনে আসে।

চ্যানেলের নাব্যতা রক্ষা ও নৌযান চলাচল নিরাপদ করতে ১৯৮৫-৯০ মেয়াদি তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিলকল্পনায় বিআইডব্লিউটিএ'র জন্য বেশকিছু লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। নৌপথের হাইড্রোলিক পরিবর্তনের রেকর্ড সংরক্ষণ ও সে অনুযায়ী কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ এর মধ্যে অন্যতম। পাশাপাশি কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতের ডেককর্মীদের প্রশিক্ষণও অব্যাহত রাখা হয়।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার নৌপথের উন্নয়নে শুরুতে ১৯টি প্রকল্পের বিপরীতে বিআইডব্লিউটিএ'র অনুকূলে ৮৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। পরে আরও ১৩টি প্রকল্প যুক্ত করে প্রকল্পের সংখ্যা উন্নীত করা হয় ৩১টিতে। এর মধ্যে ১৯৯০ সালের মধ্যে সম্পাদনের জন্য ২৮টির কাজ শুরু হয় এবং ২০টি সম্পন্ন হয়। এতে ব্যয় হয় ৭১ কোটি ৩৪ লাখ টাকা, যা মূল বরাদ্দের ৮৭ দশমিক ৩৮ শতাংশ।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় বিআইডব্লিউটিএ'র জন্য যেসব লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

- ১৭১ কিলোমিটার নৌপথ উন্নয়ন;
- দিবা-রাত্রি নিরাপদে নৌযান চলাচলে সহায়তার লক্ষ্যে ৪৮০ কিলোমিটারে নেভিগেশনাল মার্কিং;
- গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোয় দেড়শটি লঞ্চ ল্যান্ডিং স্টেশন নির্মাণ;
- বিদ্যমান ফেরিঘাটগুলোর মানোন্নয়নের পাশাপাশি নতুন নতুন সুবিধা তৈরি;
- তিনটি হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ জাহাজ ক্রয় ও
- নদীবন্দরগুলোয় কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ের কারিগরি
- অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা খতিয়ে দেখা।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অর্থাৎ ১৯৮৫ থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে ১৬৪ কিলোমিটার নৌপথের উন্নয়ন সম্পন্ন করে বিআইডব্লিউটিএ। ২৩ লাখ ঘনমিটার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে পলি খনন করা হয় ২১ লাখ ঘনমিটার। লঞ্চ ল্যান্ডিং স্টেশন পুনর্বাসন করা হয় ২২টি। যদিও লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৭৫টি ল্যান্ডিং স্টেশন পুনর্বাসনের। এই সময়কালে ৭৫টি লঞ্চ ল্যান্ডিং স্টেশন নির্মাণের কথা থাকলেও সেগুলো নির্মিত হয়নি। এছাড়া তিনটি জরিপ জাহাজ ক্রয় প্রকল্পটিও সম্পন্ন হয়নি।

১৯৯০-৯৫: পরিবহন মাধ্যম পণ্যের উৎপাদন, বিতরণ ও পরিভোগকেই কেবল প্রভাবিত করে না, অর্থনীতির বিভিন্ন খাতের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ লিংকেজ হিসেবেও কাজ করে। অর্থনীতির প্রসারের লক্ষ্যে খাতটির উন্নয়নে ১৯৯০-৯৫ মেয়াদি চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিভিন্ন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এজন্য ১৯৮৯-৯০ সালে যমুনা বহুমুখী সেতু (বর্তমানে বঙ্গবন্ধু সেতু) প্রকল্পের অর্থ বাদে পরিবহন খাতে অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয় সাকল্যে ৮ হাজার ৭ কোটি টাকা। তবে পরিবহনের প্রধানতম মাধ্যম হওয়া সত্ত্বেও নৌপরিবহন খাত পায় মোট বরাদ্দের ১০ শতাংশ। বরাদ্দের ৩৪ শতাংশই যায় সড়ক পরিবহন খাতে। উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বরাদ্দ পায় রেল খাতও।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে বরাদ্দ বিভাজনের দিকে নজর দিলে দেখা যায়, সড়ক ও সড়ক পরিবহন খাত পেয়েছে ২ হাজার ৭৪৫ কোটি, রেলওয়ে ৮৩৫ কোটি ও নৌপরিবহন খাতে গেছে ৭৯৩ কোটি টাকা। এর মধ্যে বিআইডব্লিউটিএ'র অনুকূলে বরাদ্দ ১৮২ কোটি টাকা, যা এই খাতে বরাদ্দের মাত্র ২৩ শতাংশ। এই বরাদ্দে ১৯৯০-৯৫ সময়কালে বিআইডব্লিউটিএ কিছু উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

- সারা বছর নৌ চলাচলের উপযোগী সর্বনিম্ন গভীরতা ধরে রাখতে নির্বাচিত কিছু নদী/চ্যানেল খনন করা;
- দিনে ও রাতে নৌ চলাচল নিরাপদ করতে ৩৭২ কিলোমিটারে নেভিগেশন মার্কিং;
- নতুন ৪০টি লঞ্চ ল্যান্ডিং স্টেশন নির্মাণ এবং ৪৫টি পন্টুন ও গ্যাংওয়ের পুনর্বাসন;
- দুটি হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ জাহাজ ক্রয়;
- বুড়িগঙ্গার ডাউন স্ট্রিমে জেনারেল কার্গো পোর্ট ও কনটেইনার বার্থ নির্মাণ;
- স্থলের সাথে নৌযানের বিদ্যমান টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও
- ড্রেজার বহর ও জরিপ জাহাজকে সহায়তাকারী সাপোর্ট জলযান ও যন্ত্রপাতি ক্রয়।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় অর্থাৎ ১৯৯০-৯৫ মেয়াদে গৃহীত কর্মসূচিগুলোর মধ্যে বিআইডব্লিউটিএ ২৪৬ কিলোমিটার নৌপথ খনন করে। ৯৯টি পন্টুন পুনর্বাসনের পাশাপাশি ৪টি হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ জাহাজও ক্রয় করে এই সময়ে। সেই সাথে উপকূলীয় প্রায় ৭৫ শতাংশ এলাকার ম্যাপিং সম্পন্ন করে কর্তৃপক্ষ।

১৯৯৬-২০০১: অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন খাতের উন্নয়নে বড় ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয় ১৯৯৬ সালে। ১৯৯৭ সালের জুন পর্যন্ত বিআইডব্লিউটিএ ৮টি প্রকল্প সম্পন্ন করে। এসব প্রকল্পের আওতায় ২০টি পন্টুন মেরামত ও প্রতিস্থাপনের পাশাপাশি যমুনা নদীর রেল ফেরি রুট খনন করা হয়। সেই সাথে পাঁচটি ওয়ার্ক বোট ও তিনটি অ্যাকোমোডেশন বার্জও ক্রয় করে কর্তৃপক্ষ। স্থল থেকে স্থল, স্থল থেকে নৌযান এবং নৌযান থেকে নৌযানের মধ্যে উন্নত যোগাযোগের জন্য ৬৩টি টেলিকমিউনিকেশন সেটও কেনা হয় এই সময়েই।

১৯৯৭-২০০২ মেয়াদি পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন খাতে বিদ্যমান চ্যানেল ও বন্দরের চ্যানেলগুলোর উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণে বিশেষ জোর দেওয়া হয়। সেই সাথে নদীবন্দর, জেটি এবং ইনল্যান্ড কনটেইনার পোর্ট ও ডিপো উন্নয়নের কথাও সমান গুরুত্বের সাথে বলা হয়। বরাবরের মতো পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতেও গ্রামীণ অঞ্চলে লঞ্চ ল্যান্ডিং স্টেশন নির্মাণের পাশাপাশি নিরাপদ নৌ চলাচল বিশেষ গুরুত্ব পায়। বিদ্যমান প্রথাগত দেশীয় নৌকার যান্ত্রিকীকরণের লক্ষ্যও ধরা হয় এই পরিকল্পনায়।

পরিকল্পনা অনুযায়ী, এই সময়কালে গুরুত্বপূর্ণ নদীগুলোতে মোট ১ কোটি ঘনমিটার খননকাজ সম্পন্ন করা হয়। সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে এগুলো পুনর্বাসন করা হয় পুরনো পাঁচটি ড্রেজার। আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ কাজ এ সময় সম্পন্ন করে বিআইডব্লিউটিএ। ঢাকা ও দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে যাতায়াতে ফেরিরুট পারাপারে সময় ও খরচ বাঁচাতে আরিচার পরিবর্তে পাটুরিয়াতে ফেরি টার্মিনাল, পার্কিং ইয়ার্ডসহ আনুষঙ্গিক অন্য সুবিধাদি নির্মাণ এবং পন্টুন ও গ্যাংওয়ে স্থাপন করা হয়। উপকূলীয় অঞ্চলের উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রয়োজনে উপকূলীয় অঞ্চলের পূর্ণাঙ্গ ম্যাপও প্রস্তুত করা হয় এই সময়কালে।

২০০২-২০০৮: ১৯৯৬ সালে দেশের অভ্যন্তরীণ নৌপথের উন্নয়নে নানা উদ্যোগ নেওয়া হলেও পরের দিকে তাতে ভাটা পড়ে। ২০০২ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত খাতটি উন্নয়নের ধারা সেভাবে ধরে রাখতে পারেনি। এই সময়কালে প্রকল্প সম্পন্ন হয় মাত্র ১১টি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ২০০৪ সালের জুনে যমুনা নদীতে চাঁদপুর ও শরীয়তপুরের মধ্যে ফেরি সার্ভিস চালু করে টার্মিনাল, ঘাট ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ; ২০০৫ সালে সদরঘাট থেকে আশুলিয়া ব্রিজ পর্যন্ত যাতায়াতের জন্য নতুন একটি নৌরুট চালু এবং একই বছর মুন্সিগঞ্জের মীরকাদিমে নতুন একটি নদীবন্দর নির্মাণ। গাবখান খালের নাব্যতা উন্নয়ন ও প্রশস্থতা বাড়াতে খালের ১৮ লাখ ৫০ হাজার ঘনমিটার খনন করা হয়। পাশাপাশি চারটি গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ দিলালপুর-জকিগঞ্জের শান্তিপুর অংশ; মোহনপুর-দইখাওয়া রুটের দৌলতদিয়া, চর রক্ষা, মিনিদিয়া, মাওয়া; আরিচা-রাজশাহী-গোদাগাড়ি-ভোলাহাট রুটের পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া ফেরি চ্যানেল এবং মজুচৌধুরীর হাট লঞ্চঘাট-মেঘনা রুটের রহমত আলী খাল এলাকার মোট ৩৯ লাখ ৭২ হাজার ঘনমিটার খনন করা হয় এই সময়কালে।

২০০৯-২০২০: উন্নত অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন ব্যবস্থাপনার যাত্রা মূলত এই সময়ে। ২০১১-২০১৫ মেয়াদি ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে অভ্যন্তরীণ নৌপথকেন্দ্রিক বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় নদী খনন এবং শুকিয়ে যাওয়া ও মরে যাওয়া নৌরুটগুলো ফিরিয়ে আনার বিষয়টি। নদীবন্দর উন্নয়নের পাশাপাশি ঢাকার চারপাশের নদীগুলোর নাব্যতা ফিরিয়ে আনা ও প্রশস্থ করার ওপরও গুরুত্ব দেওয়া হয় পরিকল্পনাতে। এর উদ্দেশ্য কেবল অবকাঠামো উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা নয়, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখার মধ্য দিয়ে দারিদ্র্যদূরীকরণে সহায়তা করা।

এই লক্ষ্য সামনে রেখে আলোচ্য সময়কালে বিআইডব্লিউটিএ বরিশাল নদীবন্দরের উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন; চট্টগ্রামের কুমিরায় আরসিসি জেটি নির্মাণ; বুড়িগঙ্গা নদী ও নদীতীরভূমি দখলমুক্ত রাখার লক্ষ্যে বন্দর ও অন্যান্য সুবিধাদি নির্মাণ; আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতিসহ একটি ড্রেজার সংগ্রহ; উদ্ধারকারী জলযান সংগ্রহ; ঢাকা শহরের চারদিকে বৃত্তাকার নৌপথ চালুকরণ (২য় পর্যায়) এবং নওয়াপাড়া-ভৈরব-আশুগঞ্জ ও বরগুনায় নদীবন্দর স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করেছে বিআইডব্লিউটিএ।

২০১৫-২০২০: গুরুত্বপূর্ণ নদীপথ খনন ও পুনর্খননের বিশাল কর্মযজ্ঞ জোরদার করার প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ করা হয় আওয়ামী লীগের ২০১৪ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে। ক্রমে ভরাট হয়ে যাওয়া নৌপথগুলো পুনরুদ্ধার ও খননের মাধ্যমে নাব্যতা বৃদ্ধি ও নৌ চলাচলের উপযোগী করে তোলার কথা বলা হয় সেখানে। প্রধান নদী ও নৌপথগুলোর নাব্যতা বৃদ্ধি ছাড়াও ভরাট ও পরিত্যক্ত নৌপথগুলো ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে নদীর পুনরুজ্জীবনের প্রকল্পগুলোর কাজ অব্যাহত রাখার ঘোষণাও দেওয়া হয় ওই ইশতেহারে। আর ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে অঙ্গীকার করা হয় সরকারের এই মেয়াদেই প্রায় ১০ হাজার কিলোমিটার নৌপথ খননের, যাতে করে আন্তর্জাতিক সমুদ্রবন্দরের সাথে অভ্যন্তরীণ নৌপথগুলোর সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানি সুগম হয়।

এসব প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন দেখা গেছে ২০১৫-২০২০ মেয়াদি সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে। দেশের বিশাল অভ্যন্তরীণ নৌপথের ওপর ভিত্তি করে একটি

নদী বৈভিন্ন্য

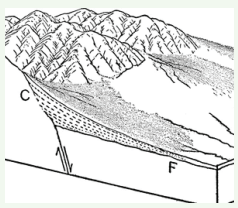

পলল ও পলি

গতিশীলা নদী বা জলধারা বাহিত তলানি জমে যে জমির সৃষ্টি হয় তাই পলল। নদীর মোহনায় বদ্বীপ, চর বালিয়াড়ি, নিচু জলাভূমি প্রভৃতি আকারেই মূলত পলল গড়ে ওঠে। আর আবহিক বিকারের জন্য সৃষ্ট বালি অপেক্ষা সূক্ষ্ম, কাদামাটি অপেক্ষা মোটা মাটির কণা, যা নদীর বন্যার পানিতে ভেসে জমি উর্বরা করে তাই পলি। শিলায় জমা হলে পলি শ্লেটের মতো, কিন্তু কোমলতর, শেল পাথরে পরিণত হয়।

লুটডিখ খাল

প্রাকৃতিক নদী নয় বলেই ১৮৩২ সালে খননকৃত ১১০ মাইল দীর্ঘ নদীতুল্য এই জলাধারকে খাল অপবাদ বইতে হচ্ছে। জার্মানির বাভেরিয়া অঞ্চলের বামবের্ক থেকে ফুট পর্যন্ত রেগনিটস নদীর সমান্তরালে বয়ে গিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বেঁকে নিউরেমবার্গ পেরিয়ে আল্টনুল পর্যন্ত গিয়েছে এবং মেইন নদী হয়ে দানিউব ও রাইন নদীকে সংযুক্ত করেছে। ১৮০ টন পর্যন্ত ওজনের জাহাজ চলাচল করতে পারে খালটি দিয়ে।

তথ্যসূত্র: মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকা

নিরাপদ ও স্বল্পব্যয়ী অভ্যন্তরীণ পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে পরিকল্পনায়। এসব পরিকল্পনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

♦ ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ নৌপথের নাব্যতা বৃদ্ধি এবং মৃত ও মৃতপ্রায় নদী খাতগুলোর পুনরুজ্জীবন;

♦ নিয়মিত ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে নৌপথের নাব্যতা সংরক্ষণ;

♦ অভ্যন্তরীণ নদীবন্দর স্থাপনের মাধ্যমে যাত্রী ও পণ্য পরিবহন বৃদ্ধি এবং পণ্য ও যাত্রীবাহী নৌযানের সুষ্ঠু ও নিরাপদ চলাচলে সহায়তা দান;

♦ ইনল্যান্ড কনটেইনার পোর্ট নির্মাণ;

♦ ওয়েবভিত্তিক ডাটাবেজ অ্যাপ্লিকেশন চালু করে বিআইডব্লিউটিএ প্রদত্ত সকল সেবার ডিজিটাইজ করা;

♦ ঢাকার চারপাশের নৌপথগুলো দূষণমুক্ত ও পুনরুদ্ধার করে নাব্যতা ও প্রশস্থতা বাড়ানো।

এই প্রাধিকার ও কৌশলগুলো বাস্তবায়নে বিআইডব্লিউটিএ একটি সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, উল্লিখিত মেয়াদে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও টঙ্গী নদীবন্দরের আওতাধীন এলাকার উচ্ছেদকৃত তীরভূমিতে ভৌত সুবিধাদি নির্মাণ করেছে সংস্থাটি। পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ নৌপথের নাব্যতা রক্ষায় দুটি ড্রেজার, ক্রেনবোট, ক্রু-হাউস বোট এবং টাগবোটসহ আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি সংগ্রহ; মাদারীপুর-চরমুগুরিয়া-টেকেরহাট-গোপালগঞ্জ নৌপথ খনন; সদরঘাট টার্মিনাল ভবন সম্প্রসারণ; দক্ষিণ অঞ্চলের বিভিন্ন ল্যান্ডিং স্টেশনে বন্দর সুবিধাদি নির্মাণ (১ম সংশোধিত); ডিজিটাল গেজ সংগ্রহ ও স্থাপন এবং গ্লোবাল সিস্টেম ফর মোবাইল (জিএসএম) নেটওয়ার্কের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ; মাদারীপুর শিপ পার্সোনেল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপন (২য় সংশোধিত); সন্দ্বীপের গুপ্তছড়ায় আরসিসি জেটি পুনর্নির্মাণ (১ম সংশোধিত) এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় নৌপথের নাব্যতা উন্নয়ন ও ল্যান্ডিং সুবিধাদি প্রদানের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা হয়েছে।

সব মিলিয়ে প্রতিষ্ঠার পর এ পর্যন্ত মোট ১৭০টি প্রকল্প সম্পন্ন করেছে বিআইডব্লিউটিএ। এর মধ্যে স্বাধীনতা-পরবর্তী ৫০ বছরে সম্পন্ন করেছে ১৩৭টি প্রকল্প।

স্বাধীনতা-পরবর্তী ৫ দশকে বিআইডব্লিউটিএ সম্পাদিত প্রকল্প

প্রকল্প	সম্পাদনের সময়
ফেঞ্চুগঞ্জের আপস্ট্রিমে কুশিয়ারা নদীতে লুপ কাটিং	ডিসেম্বর, ১৯৭৩
নৌপথ ও নদীবন্দর উন্নয়নে জরিপ, অনুসন্ধান ও গবেষণা	জুন, ১৯৭৪
মোংলা-ঘষিয়াখালী চ্যানেল খনন	সেপ্টেম্বর, ১৯৭৫
৪০টি লঞ্চ ল্যান্ডিং স্টেশন উন্নয়ন	জুন, ১৯৭৫
হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ	জুন, ১৯৭৫
নাব্য নৌপথে বার্ষিক সংরক্ষণ ড্রেজিং	জুন, ১৯৭৫
পটুয়াখালীতে সেকেন্ডারি নদীবন্দর উন্নয়ন	জুন, ১৯৭৬
মাস্টার, সারেং ও ডেককর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণকেন্দ্র নির্মাণ	জুন, ১৯৭৭
তালতলা খাল পুনর্খনন	জুন, ১৯৭৭
খানপুরে আরসিসি জেটি সম্প্রসারণ	জুন, ১৯৭৭
ভৈরব বাজার থেকে ফেঞ্চুগঞ্জ পর্যন্ত মেঘনা/কুশিয়ারা খনন	জুন, ১৯৭৮
ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক রক্ষার্থে শেরপুরের আপস্ট্রিমে কুশিয়ারা নদীতে লুপ কাটিং	জুন, ১৯৭৮
অভ্যন্তরীণ নৌপথ ও উপকূলীয় অঞ্চলে হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ	জুন, ১৯৭৮
আরিচা, গোয়ালন্দ, নগরবাড়ি ইত্যাদি ফেরি টার্মিনাল উন্নয়ন/মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণ	জুন, ১৯৭৯
৫টি ড্রেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয়	জুন, ১৯৮০
বরিশাল নদীবন্দরের বিদ্যমান সুবিধাদি উন্নতকরণ (দ্বিতীয় পর্যায়)	জুন, ১৯৮০
অতিরিক্ত ৫১টি লঞ্চ স্টেশন উন্নয়ন	জুন, ১৯৮০
ইছামতী নদী খনন	জুন, ১৯৮০
গ্রামাঞ্চলে ৫১টি লঞ্চ স্টেশন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	জুন, ১৯৮০
নদী ও উপকূলীয় অঞ্চলের হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ, হাইড্রোলিক ইনভেস্টিগেশন ও গবেষণা	জুন, ১৯৮০
অ্যাকাউন্টিং ও ফিন্যান্সিয়াল সিস্টেমের জন্য পরামর্শ সেবা	জুন, ১৯৮০
বরিশাল মেরিন ওয়ার্কশপের উন্নয়ন	জুন, ১৯৮১
খুলনায় (মহেশ্বরপাশা) নদীবন্দর উন্নয়ন দ্বিতীয় পর্যায় (আরসিসি জেটি)	জুন, ১৯৮১
দেশীয় নৌকা যান্ত্রিকীকরণের দ্বিতীয় পরীক্ষামূলক প্রকল্প	জুন, ১৯৮১
নারায়ণগঞ্জের ইকরামপুরে কাঠের ফুড জেটি আরসিসি জেটি দ্বারা প্রতিস্থাপন	জুন, ১৯৮১
কার্গো হ্যান্ডলিং সিস্টেম নিয়ে গবেষণার জন্য পরামর্শক সেবা গ্রহণ	জুন, ১৯৮১
ঢাকায় নদীবন্দর উন্নয়ন (দ্বিতীয় পর্যায়)	জুন, ১৯৮২
বিআইডব্লিউটিএ'র জন্য কার্গো হ্যান্ডলিং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ	জুন, ১৯৮২
ড্রেজিংয়ের (১৯৮০-৮৫) মাধ্যমে নৌপথের উন্নয়ন: ১. ঢাকা জেলার নারিশা-পাশিমাচার খাল খনন। ২. শ্রীনগর-আলমপুর খাল খনন। ৩. শিকারিপাড়া খাল খনন।	জুন, ১৯৮২
সারিয়াকান্দি, পাইকগাছা, আজাদপুর ও জাজিরায় লঞ্চঘাট	জুন, ১৯৮২
চিলমারিতে নদীবন্দর স্থাপনে কারিগরি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	জুন, ১৯৮২

প্রকল্প	সম্পাদনের সময়
যান্ত্রিক নৌযানের জন্য নকশা ও পরিদর্শন কার্যালয়	জুন, ১৯৮৩
উদ্ধার জাহাজ 'রুস্তম' ক্রয়	জুন, ১৯৮৩
পাবনার বাঘাবাড়িতে নদীবন্দর স্থাপন	জুন, ১৯৮৩
৩টি অ্যালুমিনিয়াম হালের সার্ভে ওয়ার্কস বোট সংগ্রহ	জুন, ১৯৮৩
আরিচা, নগরবাড়ি, দৌলতদিয়া ও কাজিরহাটে ফেরি টার্মিনাল উন্নয়ন	জুন, ১৯৮৩
সদরঘাটের বিদ্যমান প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল সম্প্রসারণ	জুন, ১৯৮৪
বরিশাল নদীবন্দর এলাকায় জাইলখালের ওপর আরসিসি ব্রিজ নির্মাণ	জুন, ১৯৮৪
ভাঙন থেকে বরিশাল নদীবন্দর রক্ষায় সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	জুন, ১৯৮৪
লাক্ষ্যা ও ভৈরব অববাহিকা উন্নয়নে কারিগরি ও অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	জুন, ১৯৮৪
প্রধান নদীবন্দর ও লঞ্চ স্টেশনগুলোর টার্মিনাল পন্টুন মেরামত ও প্রতিস্থাপন	জুন, ১৯৮৫
সিরাজগঞ্জের ভুএগাপুরে যমুনা নদীতে ফেরি টার্মিনাল সুবিধা	জুন, ১৯৮৫
পল্লি অঞ্চলে ৫০টি লঞ্চ ল্যান্ডিং স্টেশন উন্নয়ন	জুন, ১৯৮৫
অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন খাতে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন	জুন, ১৯৮৫
নেভিগেশনাল যন্ত্রপাতি সংগ্রহ	জুন, ১৯৮৬
অভ্যন্তরীণ নৌপথের হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ, হাইড্রোলিক ইনভেস্টিগেশন ও সংরক্ষণ কাজ	জুন, ১৯৮৬
ক্র্যাশ প্রোগ্রামের আওতায় ৪টি লঞ্চ ক্রয়	জুন, ১৯৮৬
ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ এলাকায় বন্দর সুবিধা প্রদানে মহাপরিকল্পনা তৈরির লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	জুন, ১৯৮৭
৬টি মৃত ও মৃতপ্রায় নৌপথ পুনরুদ্ধার	জুন, ১৯৮৭
ভুএগাপুর, বালাশি ও চিলমারি ফেরিঘাটে ফেরি টার্মিনাল উন্নয়ন	জুন, ১৯৮৭
দৌলতদিয়ায় ফেরি টার্মিনাল উন্নয়ন ও আরিচায় ট্রাক পার্কিং ইয়ার্ডের সম্প্রসারণ	জুন, ১৯৮৭
ভৈরবে নদীবন্দর উন্নয়ন	জুন, ১৯৮৮
বিআইডব্লিউটিএ'র ক্ষয়িষ্ণু ১০টি পন্টুন পুনর্বাসন/প্রতিস্থাপন	জুন, ১৯৮৮
বরিশাল সিএসডি ঘাটের কাঠের ফুড হ্যান্ডলিং জেটিকে পন্টুন জেটিতে রূপান্তর	জুন, ১৯৮৮
নদীবন্দরে কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ের লক্ষ্যে কারিগরি ও অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	জুন, ১৯৮৮
বিআইডব্লিউটিএ'র বন্যা পুনর্বাসন প্রকল্প, ১৯৮৫	জুন, ১৯৮৯
বিআইডব্লিউটিএ'র ১০টি জরিপ জাহাজের বড় ধরনের মেরামত	জুন, ১৯৮৯
নৌপথের উন্নয়নে মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে কারিগরি ও অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	জুন, ১৯৮৯

স্বাধীনতা-পরবর্তী ৫ দশকে বিআইডব্লিউটিএ সম্পাদিত প্রকল্প

প্রকল্প	সম্পাদনের সময়
নারায়ণগঞ্জ ফেরিঘাটে ডাইভারশন রোড, পার্কিং ইয়ার্ড ও আনুষঙ্গিক সুবিধা নির্মাণ	জুন, ১৯৮৯
কুমিল্লার দাউদকান্দিতে নদীবন্দর স্থাপন	জুন, ১৯৯০
মাওয়া ও চরজানাজাতে ফেরি টার্মিনাল উন্নয়ন	জুন, ১৯৯০
১৯৮৭ সালের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত বিআইডব্লিউটিএ'র স্থাপনা সংস্কারের কর্মসূচি	ডিসেম্বর, ১৯৯০
স্ট্যান্ডার লো ওয়াটার (এসএলডব্লিউ) ও স্ট্যান্ডার্ড হাই ওয়াটার (এসএইচডব্লিউ) লেভেল নির্ধারণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	জুন, ১৯৯০
বিআইডব্লিউটিএ'র ৭টি নৌযান মেরামতের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে সমীক্ষা	জুন, ১৯৯০
ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ নদীবন্দরে কনটেইনার টার্মিনাল সুবিধা উন্নয়নে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	জুন, ১৯৯১
তিনটি হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ জাহাজ ক্রয়	জুন, ১৯৯২
দেশীয় নৌকার দক্ষতা উন্নয়ন ও লাভজনক করতে পরীক্ষামূলক প্রকল্প	জুন, ১৯৯২
টাইডাল ডাটার কম্পিউটার অ্যানালাইসিসে বিশেষজ্ঞ সেবা ও সহায়ক সরঞ্জাম সংগ্রহ	জুন, ১৯৯২
বিদ্যমান নৌপথের উন্নয়ন ড্রেজিং	জুন, ১৯৯২
ইলেকট্রনিক পজিশন ফিক্সিং সিস্টেম স্থাপনে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	জুন, ১৯৯৩
৪৫টি পন্টুন ও গ্যাংওয়ে মেরামত	জুন, ১৯৯৪
বিআইডব্লিউটিএ'র বন্যা পুনর্বাসন প্রকল্প, ১৯৮৮	জুন, ১৯৯৪
বাঘাবাড়ি নদীবন্দর পুনর্বাসন ও উন্নয়ন এবং অভ্যন্তরীণ নৌযান/ফেরি চলাচল নির্বিঘ্ন করতে যমুনা নদীর নগরবাড়ি-বাঘাবাড়ি রুট ও করতোয়ার নৌপথ খনন	জুন, ১৯৯৫
কুতুবদিয়া দ্বীপের বারোঘোপ ও সাত্তার উদ্দিনে আরসিসি জেটি ও অ্যাপ্রোচ রোড নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	জুন, ১৯৯৫
২০টি পন্টুন মেরামত ও প্রতিস্থাপন	জুন, ১৯৯৬
হাই ফ্রিকোয়েন্সি টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন	জুন, ১৯৯৭
কুতুবদিয়া দ্বীপের বারোঘোপ ও সাত্তার উদ্দিনে আরসিসি জেটি ও অ্যাপ্রোচ রোড নির্মাণ	জুন, ১৯৯৭
শুষ্ক মৌসুমে নাব্যতা ধরে রাখতে যমুনা নদীর রেলওয়ে ফেরি রুট খনন	জুন, ১৯৯৭
নগরবাড়ির পরিবর্তে নোতাখোলায় স্থায়ী ফেরিঘাট, পার্কিং ইয়ার্ড ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদি নির্মাণ	জুন, ১৯৯৭
৫টি সার্ভে ওয়ার্কস বোট ও ৩টি অ্যাকোমোডেশন বার্জ ক্রয়	জুন, ১৯৯৮
বিদ্যমান নৌপথের খনন এবং ড্রেজিং কার্যক্রম ও দক্ষতার উন্নয়ন	জুন, ২০০০
নৌ চলাচলে সহায়ক উপকরণ সংগ্রহ	জুন, ২০০০
ইলেকট্রনিক পজিশনিং ফিক্সিং সিস্টেম স্থানান্তর	জুন, ২০০০
আরিচার ডাউনস্ট্রিমে পাটুরিয়ায় আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ ফেরি টার্মিনাল নির্মাণ	জুন, ২০০০
ডিপিটিসির আধুনিকায়ন	জুন, ২০০০
পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের নৌপথের সাতটি স্থানে ল্যান্ডিং সুবিধাদি নির্মাণ	ডিসেম্বর, ২০০০
বিআইডব্লিউটিএ'র বন্যা পুনর্বাসন প্রকল্প, ১৯৯৮	ডিসেম্বর, ২০০০

প্রকল্প	সম্পাদনের সময়
দেশীয় নৌকা খাতের উন্নয়নে কারিগরি সহায়তার লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে ৫টি বোট সেন্টার স্থাপন	জুন, ২০০০
উপকূলীয় অঞ্চলের ম্যাপিং (প্রথম পর্যায়)	জুন, ২০০১
পল্লী অঞ্চলে ১৭৫টি লঞ্চ স্টেশন উন্নয়ন	জুন, ২০০১
নগরবাড়ি/নাটাখোলার বিকল্প ফেরিঘাট নির্বাচনে হাইড্রোলিক ও মরফোলজিক্যাল গবেষণা	জুন, ২০০৩
উপকূলীয় তিন উপজেলা কক্সবাজার, সন্দ্বীপ ও মনপুরায় রিভার ক্রাফটের ল্যান্ডিং সুবিধাদির জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও বিস্তারিত নকশা প্রণয়ন	অক্টোবর, ২০০৩
চাঁদপুর ও শরীয়তপুরের মধ্যে ফেরি সার্ভিস চালুর নিমিত্তে হরিণাঘাট ও আলুবাজারে ফেরি টার্মিনাল, ফেরিঘাট ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদি নির্মাণ	জুন, ২০০৪
নদীভাঙনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত চাঁদপুর নদীবন্দরের টার্মিনাল ভবন ও ল্যান্ডিং সুবিধাদি পুনর্বাসন	জুন, ২০০৪
ঢাকার চারপাশে নৌপথ চালু	জুন, ২০০৫
মুন্সিগঞ্জ জেলার মুন্সিগঞ্জ-মীরকাদিম এলাকায় নদীবন্দর স্থাপন	জুন, ২০০৫
পাটুরিয়া ফেরিঘাটে অবকাঠামোসহ বাস ও ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ	জুন, ২০০৬
উপকূলীয় তিন উপজেলা কক্সবাজার সদর, সন্দ্বীপ ও মনপুরায় জলযানের জন্য ল্যান্ডিং সুবিধাদিসহ স্টেশন নির্মাণ	জুন, ২০০৭
দিবা-রাত্রি অভ্যন্তরীণ নৌযানে নিরাপদ চলাচলে নেভিগেশনাল উপকরণ স্থাপন, পুনঃস্থাপন ও আধুনিকায়ন	জুন, ২০০৭
ঢাকা-মোংলা ও চট্টগ্রাম-মোংলা নৌরুটকে সংযোগকারী গাবখান ক্যানেল খননের মাধ্যমে নাব্যতা উন্নয়ন ও প্রসস্থ করা	ডিসেম্বর, ২০০৭
ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে চারটি গুরুত্বপূর্ণ নৌপথের নাব্যতা উন্নয়ন	জুন, ২০০৮
নৌপথের নাব্যতা ধরে রাখতে দীর্ঘমেয়াদি ড্রেজিং কর্মসূচিসহ তিনটি ড্রেজার, একটি বুস্টার পাম্প ও আনুষঙ্গিক ড্রেজিং উপকরণ ক্রয়	জুন, ২০০৯
নদীবন্দরগুলোয় পন্টুন নির্মাণ	জুন, ২০০৯
২০০৭ সালে ঘূর্ণিঝড় সিডরে ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো পুনর্বাসন ও পুনর্নির্মাণ	জুন, ২০০৯
পানগাঁও অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার নৌ-টার্মিনাল নির্মাণ	জুলাই ২০০৫-জুন ২০১১
বরিশাল নদীবন্দরের উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন	জুলাই ২০০৯-জুন ২০১২
চট্টগ্রামস্থ কুমিরায় আরসিসি জেটি নির্মাণ	জানুয়ারি ২০১০-ডিসেম্বর ২০১২
সন্দ্বীপস্থ গুপ্তছড়ায় নবনির্মিত আরসিসি জেটির সম্প্রসারণ	জুলাই ২০০৬-জুন ২০১২
বুড়িগঙ্গা নদী ও নদী তীরভূমি দখলমুক্ত রাখার লক্ষ্যে বন্দর ও অন্যান্য সুবিধাদি নির্মাণ	জুলাই ২০০৬-জুন ২০১২
আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতিসহ একটি ড্রেজার সংগ্রহ	জুলাই ২০০৮-জুন ২০১২
উদ্ধারকারী জলযান সংগ্রহ	জানুয়ারি ২০০৬-জুন ২০১৩
ঢাকা শহরের চারদিকে বৃত্তাকার নৌ-পথ চালুকরণ (২য় পর্যায়)	জুলাই ২০০৭-জুন ২০১৩
নোয়াপাড়া ভৈরব-আশুগঞ্জ ও বরগুনায় নদীবন্দর স্থাপন	জুলাই ২০০৮-জুন ২০১৩
ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ এবং টঙ্গী নদীবন্দর এলাকায় নিয়ন্ত্রণাধীন উচ্ছেদকৃত তীরভূমিতে ভৌত সুবিধাদি নির্মাণ	---

নদী বৈভিন্ন্য

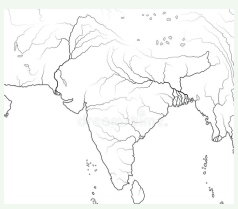

বদ্বীপ

নদীর মোহনায় ত্রিকোনাকার বা মাত্রাহীন 'ব' অক্ষরের আকারে সৃষ্ট দ্বীপ। নদীবাহিত বালি ও অন্যান্য লঘু পদার্থ সাগরের কাছে স্রোতের অভাবে সঞ্চিত হয় এবং জলধারা স্বাভাবিক গতিপথ হারিয়ে দু'পাশ দিয়ে বয়ে যায়। নাইজার, মিসিসিপি, সিন্ধু, গঙ্গা, ইরাবতী, ইউফ্রেতিস, হোয়াং প্রভৃতি নদীর বদ্বীপ উল্লেখযোগ্য। বিশেষজ্ঞরা সমগ্র বাংলাদেশকেই গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের বদ্বীপ বলে থাকেন।

অববাহিকা

ভূমির একটি অংশ যেখানে সমস্ত বৃষ্টিপাতের ধারা একই নির্গমন পথে (একটি প্রধান নদী, হ্রদ বা সমুদ্র) প্রবাহিত হয়। নিম্নগামী অনেকগুলো নদী ও জলাশয়ের শাখা-প্রশাখার পানি উজান থেকে অববাহিকাজুড়ে প্রবাহিত হয়ে একটি একটি নির্গমন পথে প্রস্থান করে। অববাহিকা অনেকটা ফানেলের মতো কাজ করে, যা বৃষ্টিপাত একত্রিত করে এবং জমি ও জলাশয়ের মধ্য দিয়ে একটি নির্দিষ্ট নির্গমন পথে নিষ্কাশিত করে। নদী অববাহিকা ও ক্যাচমেন্ট সংক্রান্ত পরিভাষাগুলো প্রায়শই ওয়াটারশেডের সাথে আন্তঃব্যবহারযোগ্য।

তথ্যসূত্র: মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকা

স্বাধীনতা-পরবর্তী ৫ দশকে বিআইডব্লিউটিএ সম্পাদিত প্রকল্প

প্রকল্প	সম্পাদনের সময়
অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের নাব্যতা রক্ষার্থে ২টি ড্রেজার, ক্রেনবোট, ক্রু-হাউজ বোট এবং টাগবোটসহ আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি সংগ্রহ	জানুয়ারি ২০০৯-জুন ২০১৬
মাদারীপুর-চরমুগুরিয়া-টেকেরহাট-গোপালগঞ্জ নৌপথ খনন	জানুয়ারি ২০১১-জুন ২০১৬
বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলে লঞ্চঘাট ও ওয়েসাইড ঘাট উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)	জুলাই ২০১৩-জুন ২০১৭
ঢাকা নদীবন্দরস্থ সদরঘাট টার্মিনাল ভবন সম্প্রসারণ	মার্চ ২০১৪-জুন ২০১৭
ঢাকা নদীবন্দরের আওতায় সদরঘাট হতে শ্যামানঘাট পর্যন্ত রাস্তা ও আনুষঙ্গিক অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)	জানুয়ারি ২০১৫-জুন ২০১৭
নগরবাড়ি-চিলমারিতে নদীবন্দর স্থাপন, বাঘাবাড়ি বন্দরের আধুনিকায়ন এবং আনুষঙ্গিক সুবিধাদি/অবকাঠামোসহ বিশেষ ধরনের টার্মিনাল পন্টুন নির্মাণ ও স্থাপনের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	ডিসেম্বর ২০১৬-জুন ২০১৭
টেকনাফ, কক্সবাজার (কস্তুরিঘাট), ছাতক, ফরিদপুর, ঘোড়াশাল নদীবন্দর, বিভিন্ন স্থানে ফেরি ঘাট ও জেটি উন্নয়নে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	এপ্রিল ২০১৭-জুন ২০১৮
দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন ল্যান্ডিং স্টেশনে বন্দর সুবিধাদি নির্মাণ (১ম সংশোধিত)	মার্চ ২০১৪-জুন ২০১৮
হাওর অঞ্চলে ক্যাপিটাল ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে নাব্যতা বৃদ্ধি, নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি, পর্যটন, জলাভূমি ইকোসিস্টেম, সেচ এবং ল্যান্ডিং সুবিধাদি সমন্বিত নদী ব্যবস্থাপনার সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	আগস্ট ২০১৭-জুন ২০১৮
ডিজিটাল গেজ সংগ্রহ ও স্থাপন এবং গ্লোবাল সিস্টেম ফর মোবাইল (জিএসএম) নেটওয়ার্কের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ	এপ্রিল ২০১৭-জুন ২০১৯
চট্টগ্রামের মিরসরাই ও সন্দ্বীপে, টেকনাফের সাবরাং-জলিয়ার দ্বীপে এবং কক্সবাজারের সোনাদিয়া দ্বীপে জেটি এবং অবকাঠামো নির্মাণের নিমিত্ত বিস্তারিত ডিজাইন ও সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	ফেব্রুয়ারি ২০১৮-জুন ২০১৯
বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, বালুও শীতলক্ষ্যা নদীর তীরভূমিতে ওয়াকওয়ে, ইকোপার্ক ও আনুষঙ্গিক স্থাপনা নির্মাণ (৩য় পর্যায়) এবং ঢাকা শহরের বৃত্তাকার নৌপথ, নদীর তলদেশ থেকে বর্জ্য অপসরণের লক্ষ্যে উক্ত অঙ্গসমূহের উন্নয়ন প্রস্তাব প্রস্তুতের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	জুলাই ২০১৮-সেপ্টেম্বর ২০১৯

প্রকল্প	সম্পাদনের সময়
বিআইডব্লিউটিএ'র জন্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ দুইটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন উদ্ধারকারী জলযান, ছয়টি রিভার ক্লিনিং ভেসেলসহ বিভিন্ন ধরনের ৬১টি সার্ভিস জাহাজ এবং বিভিন্ন ধরনের ১৩২টি পন্টুন সংগ্রহের লক্ষ্যে সমীক্ষা প্রস্তাব	জুলাই ২০১৮-ডিসেম্বর ২০১৯
খুলনা, নরসিংদী, বরগুনার বন্দর সুবিধাদি আধুনিকায়ন এবং গলাচিপা, মোংলা, মেঘনা, সুনামগঞ্জ, টেকেরঘাট, ঘোড়াশাল, কাঁচপুর, ভৈরব, দাউদকান্দি-বাউশিয়া নদী বন্দর উন্নয়নের নিমিত্ত সম্ভব্যতা সমীক্ষা	মার্চ ২০১৮-জুন ২০১৯
১২টি গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ খনন (১ম সংশোধিত)	অক্টোবর ২০১১-জুন ২০২০
মাদারীপুর শিপ পার্সোনেল ট্রেইনিং ইনষ্টিটিউট স্থাপন, (২য় সংশোধিত)	জুলাই ২০১৩-জুন ২০২০
সন্দ্বীপস্থ গুপ্তছড়ায় আরসিসি জেটি পুনঃনির্মাণ (১ম সংশোধিত)	জানুয়ারি ২০১৭-জুন ২০২০
পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় নৌপথের নাব্যতা উন্নয়ন ও ল্যান্ডিং সুবিধাদি প্রদানকল্পে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	ডিসেম্বর ২০১৮-মে ২০২০
বরিশাল বিভাগের নদীগুলোর নাব্যতা উন্নয়ন, পানি নিষ্কাশনসহ জলাবদ্ধতা রোধ, সেচ ব্যবস্থা এবং ল্যাণ্ডিং সুবিধাদি প্রদানকল্পে ক্যাপিটাল ড্রেজিং ও মেইনটেনেন্স ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে নদী ব্যবস্থাপনার সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	ফেব্রুয়ারি ২০১৯-ডিসেম্বর ২০২০
১০টি ড্রেজার, ক্রেনবোট, টাগবোট, অফিসার্স হাউজবোট ও ক্রু-হাউজবোটসহ অন্যান্য সহায়ক সরঞ্জাম/যন্ত্রপাতি সংগ্রহ (২য় সংশোধিত)	জুলাই ২০১১-জুন ২০২১
বালাশী বাহাদুরাবাদে ফেরিঘাটসহ আনুষঙ্গিক স্থাপনাদি নির্মাণ	জুলাই ২০১৭-জুন ২০২১
অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় নৌপথের জন্য নৌ-সহায়ক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও সংযোজন	জুলাই ২০১৯-জুন ২০২১

*সম্পাদিত প্রকল্পের তালিকার ক্ষেত্রে জুন, ২০২১ পর্যন্ত সময়ের তথ্য ব্যবহার করা হলেও প্রকাশনার অন্য সব তথ্য মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত।

প্রকল্পের তথ্যসূত্র বিআইডব্লিউটিএ।

স্বাধীনতার এই ৫০ বছরে নৌপথের সার্বিক ছবিটা বদলে গেছে। চলাচলকারী নৌযানের সংখ্যা বেড়েছে বহুগুনে। অযান্ত্রিক নৌযান হয়ে উঠেছে যান্ত্রিক। যাত্রী ও কার্গো পরিবহনও কয়েক গুন বেড়েছে। সেই সাথে বেড়েছে বিআইডব্লিউটিএ'র কর্মব্যস্ততা ও দায়িত্ব। এতোসব বর্ধিষ্ণুতার মধ্যেও ক্ষয়িষ্ণু কেবল নৌপথ। দখলের চাপে কোথাও কোথাও নদী হয়েছে সংকীর্ণ। আর দূষণে দুর্বিষহ। তবে দখল-দূষণ থেকে নদীকে মুক্ত করে চলছে নৌপথের নাব্যতা ফেরানোর এক বিরাট কর্মযজ্ঞ। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় ড্রেজিং মহাপরিকল্পনা এরই মধ্যে তৈরি হয়েছে। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের দিক-নির্দেশনায় পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যাপক খননকাজ পরিচালনা করছে বিআইডব্লিউটিএ। এই খননের মধ্য দিয়ে ২০২৪ সালের মধ্যেই ১০ হাজার কিলোমিটার নৌপথ চালু করতে চায় তারা।

তথ্যসূত্র:

- *পাকিস্তান ইকোনমিক সার্ভে ১৯৬১-৬২ ও ১৯৬৯-৭০*
- *প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা*
- *বিআইডব্লিউটিএ'র সুবর্ণজয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ*

» জিনারুল ইসলাম: সাংবাদিক

নদী বৈভিন্ন্য

পঞ্চনদ

পাকিস্তানের সিন্ধুনদের পাঁচটি শাখা ইরাবতী, চন্দ্রভাগা, বিতস্তা, শতদ্রু ও বিপাশার মিলিত জলধারা। শতদ্রু তিব্বতে উৎপন্ন হয়ে পাকিস্তানে সিন্ধুতে পড়েছে। ভারতে শতদ্রু হিমাচল প্রদেশের মধ্য দিয়ে পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমে যেখানে বাঁক নিয়েছে সেখানে বিপাশার সাথে মিলিত হয়েছে। পাকিস্তানে চন্দ্রভাগা এসে শতদ্রুতে পড়েছে। তার আগেই বিতস্তা ও ইরাবতী চন্দ্রভাগার সাথে মিশেছে। এভাবে বৃহত্তর পাঞ্জাবের পাঁচটি নদীর সবকটি জলরাশি একত্রিত হয়ে যে একক স্রোতোস্বতীর সৃষ্টি হয়েছে তাকেই সাধারণত পঞ্চনদ বা স্থানীয়ভাবে পাঞ্জনদ বলে। এই পাঞ্জনদ থেকেই পাঞ্জাবের নামকরণ।

ভাটিয়ালি

শব্দটি ভাটির সাথে সম্পর্কিত। ভাটি স্রোতে নৌকা বাইতে বাইতে সাধারণত যেসব গান গাওয়া হয় তাকেই ভাটিয়ালি বলে। দিগন্ত বিস্তৃত উন্মুক্ত নদী প্রান্তরে বা হাওরের ওপর দিয়ে বাদাম খাটিয়ে নৌকা চালাতে চালাতে সাধারণত এসব গান গাওয়া হয়। এই ভাটিয়ালি গানে কোনো যন্ত্রের ব্যবহার নেই। তবে আজকাল যন্ত্রযোগে শহরে যে ভাটিয়ালি গান গাওয়া হয়, সেগুলোকে খাঁটি ভাটিয়ালি বলা যায় না। তাছাড়া গানটাই উন্মুক্ত নদী প্রান্তরের আপন জিনিস। ওকে শহরের কংক্রিটের জঙ্গলে মোটেই মানায় না। বাংলাদেশ নদ-নদীর দেশ, তাই ভাটিয়ালি গানগুলো এই নদ-নদীকে ঘিরেই প্রধানত তৈরি হয়েছে।

তথ্যসূত্র: মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকা

´তুরাগ: টঙ্গীর আশীর্বাদ »

ভাওয়াল গড়ের পাহাড়ি বংশী এলাকা থেকে উৎপত্তি হয়ে তুরাগ নদী গাজীপুরের কালিয়াকৈরে প্রবেশ করেছে। এরপর প্রথমে কিছুটা পূর্বদিকে অগ্রসর ঢাকার মোহাম্মদপুর থানা এলাকায় বুড়িগঙ্গা নদীতে মিলিত হয়েছে।

নদীবাংলা ডেস্ক

তুরাগ ঢাকার চারপাশে প্রবাহিত চারটি নদীর একটি। এটি আসলে বংশী নদের একটি শাখা। ভাওয়াল গড়ের পাহাড়ি বংশী এলাকা থেকে উৎপত্তি হয়ে সর্পিলভাবে গাজীপুরের কালিয়াকৈরে প্রবেশ করে প্রথমে কিছুটা পূর্বদিকে অগ্রসর হয়েছে। তারপর ঢাকার মোহাম্মদপুর থানা এলাকায় বুড়িগঙ্গা নদীতে মিলিত হয়েছে।

কালিয়াকৈর উপজেলার বংশী নদ থেকে উৎপত্তি লাভ করে তুরাগ ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার বিরুলিয়া ইউনিয়নে এসে দুটি ধারায় বিভক্ত হয়েছে। এর একটি শাখা সাভার উপজেলার কাউন্দিয়া ইউনিয়নে বংশী নদে পড়েছে। আর মূল শাখাটি আমিনবাজার ইউনিয়ন পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে বুড়িগঙ্গা নদীর সাথে মিশেছে। অর্থাৎ এটি মোহাম্মদপুর থানা এলাকায় বুড়িগঙ্গায় মিলিত হওয়ার আগে কালিয়াকৈর, জয়দেবপুর, মির্জাপুর, গাজীপুর, সাভার ও মিরপুর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে।

তুরাগ নদের উৎপত্তি ও প্রবাহ সম্পর্কে আমরা বর্ণনা পাই ১৯১২ সালে প্রকাশিত যতীন্দ্রমোহন রায়ের 'ঢাকার ইতিহাস' গ্রন্থে। তার বয়ানে–

'এই নদী ময়মনসিংহ জেলা হইতে আসিয়া দরিয়াপুরের নিকটে ঢাকা জেলায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে। তথা হইতে পূর্ব্বাভিমুখে কিয়দ্দুর আসিয়া রাজাবাড়ী, বোয়ালিয়া প্রভৃতি স্থানের পার্শ্বদেশ ভেদ করিয়া পূর্ব্ববাহিনী হইয়াছে। শেনাতুল্লার সন্নিকটে মোড় ঘুরিয়া প্রায় সরলভাবে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইয়াছে; এবং মৃজপুর, কাশিমপুর, ধীতপুর, বিরলিয়া, উয়ালিয়া, বনগাঁও প্রভৃতি স্থান তীরে রাখিয়া মীরপুরের দক্ষিণে বুড়িগঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে।'

এই তুরাগেরই ছোট একটি শাখা কালিয়াকৈরের কাছ থেকে উৎপন্ন হয়ে কড্ডা এলাকার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে দক্ষিণে টঙ্গী খালে পড়েছে। স্থানীয়ভাবে এই শাখাকেও তুরাগ নদ বলে। আবার মধুপুরজঙ্গল থেকে উৎপন্ন তিনটি নদী সালদহ, লবণদহ ও গোয়ালিয়ার খাল তুরাগ নদে পড়েছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী, এ নদের দৈর্ঘ্য ৭১ কিলোমিটার ও মিরপুর অংশে প্রস্থ ২১৮ মিটার। একই স্থানে নদীর গভীরতা সাড়ে ১৩ মিটার। নদী অববাহিকার আয়তন ১ হাজার ২১ বর্গকিলোমিটার। জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত তুরাগের পানিপ্রবাহ সবচেয়ে বেশি হ্রাস পায়। সে সময় এর মিরপুর অংশে পানিপ্রবাহ থাকে ১২৪ কিউমেকের মতো এবং একই স্থানে গভীরতা থাকে সাড়ে ৪ মিটার। তবে বর্ষা মৌসুমে আগস্টে এই প্রবাহ বেড়ে দাঁড়ায় ১ হাজার ১৩৬ কিউমেকে।

বিশেষ বৈশিষ্ট্য

অধিকাংশ নদীর মতো তুরাগও বারোমাসী একটি নদ। অর্থাৎ সবসময়ই পানিপ্রবাহ থাকে। একেবারে শুকিয়ে যাওয়ার ঘটনা কোনো মাসেই ঘটে না। নদটিতে সবচেয়ে বেশি পানি প্রবাহিত হয় আগস্ট মাসে। আর সবচেয়ে কম প্রবাহ থাকে জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত তিন মাসে। এই সময় পানিপ্রবাহ হ্রাস পেয়ে ক্ষীণকায় হলেও নৌকা চলাচলের উপযোগী থাকে। তুরাগে পলিপ্রবাহ নেই। এর পানিও লবণাক্ত না। অন্যান্য নদীর মতো তুরাগেও জোয়ার-ভাটার প্রভাব রয়েছে। তবে সাধারণ বন্যায় নদের পাড় উপচিয়ে পানি প্রবাহিত হতে দেখা যায় না। তারপরও বন্যা ব্যবস্থাপনায় নদের ডানতীরে ১২ দশমিক ৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। নদের বামতীরে রয়েছে ১২ দশমিক ৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ ব্যাংক রিভারমেন্ট।

অর্থনৈতিক গুরুত্ব

এই তুরাগপাড়েই গড়ে উঠেছে কাশিমপুর, আমিনবাজার ও টঙ্গী পৌরসভা। টঙ্গীবাসীর জন্য তুরাগকে ধরা হয় আশীর্বাদ হিসেবে। কারণ, এই নদকে কেন্দ্র করেই টঙ্গীতে বিস্তৃত হয়েছে শিল্প। আবার এই শিল্পের আগ্রাসনেই তুরাগ হয়ে ওঠে টঙ্গীবাসীর অভিশাপ। তবে সব শিল্প-কারখানা নয়, এজন্য দায়ী গুটিকয়েক শিল্প-কারখানা। তীরবর্তী কিছু শিল্প-কারখানা বেপরোয়াভাবে রাসায়নিক বর্জ্য তুরাগে ফেলায় এর পানি ধীরে ধীরে দূষিত হয়ে গভীর কালো রং ধারণ করেছে। বর্ষা মৌসুমে এই দূষিত পানির রং তেমন কালো না দেখালেও শুষ্ক মৌসুমে তা স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়। দূষণের ফলে জনস্বাস্থ্যের পাশাপাশি হুমকিতে পড়েছে জলজ প্রাণীও।

অবকাঠামো

যোগাযোগ সহজ তুরাগ নদের ওপর বেশকিছু অবকাঠামো নির্মিত হয়েছে। এর মধ্যে সড়ক সেতু যেমন রয়েছে, একইভাবে আছে রেল সেতুও। এগুলো হলো টঙ্গী সড়ক ও রেল সেতু, আবদুল্লাহপুর সড়ক সেতু, আশুলিয়া সড়ক সেতু ও গাবতলী সড়ক সেতু।

এক নজরে তুরাগ

উৎস মুখ: কালিয়াকৈর/বংশী ভাওয়াল গড়ের পাহাড়ি বংশী এলাকা থেকে উৎপত্তি।
পতিত মুখ: ঢাকার মোহাম্মদপুর থানা এলাকায় বুড়িগঙ্গা নদী।
প্রবাহিত গতিপথ এলাকা: গাজীপুর জেলার সদর, কালিয়াকৈর ও জয়দেবপুর; টাঙ্গাইলের মির্জাপুর এবং ঢাকা জেলার সাভার, মিরপুর ও মোহাম্মদপুর।
দৈর্ঘ্য: ৭১ কিলোমিটার
প্রস্থ (অবস্থানসহ): ২১৮ মিটার (মিরপুর)
গভীরতা (অবস্থানসহ): ১৩ দশমিক ৫ মিটার (মিরপুর)
অববাহিকা: ১০২১ বর্গকিলোমিটার
শুকনো মৌসুমে (জানুয়ারি-মার্চ) পানিপ্রবাহ: ১২৪ কিউমেক (মিরপুর)
শুকনো মৌসুমে (জানুয়ারি-মার্চ) গভীরতা: ৪ দশমিক ৫ মিটার (মিরপুর)
বর্ষা মৌসুমে (আগস্ট) পানিপ্রবাহ: ১ হাজার ১৩৬ কিউমেক (মিরপুর)
বর্ষা মৌসুমে (আগস্ট) গভীরতা: ১৩ দশমিক ৫ মিটার (মিরপুর)

সূত্র: পানি উন্নয়ন বোর্ড

টঙ্গী নদীবন্দর: গেজেটভুক্ত প্রথম প্রজন্মের বন্দর

নদীবাংলা ডেস্ক

১৯৬০ সালে পাঁচটি নদীবন্দরের গেজেট প্রকাশিত হয়। টঙ্গী নদীবন্দর তার মধ্যে একটি। সর্বশেষ সীমানা পুনর্নির্ধারণ করে নদীবন্দরটির গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় ২০০৪ সালের ১৯ অক্টোবর।

বাংলার পরিবহন ব্যবস্থায় নদী ও নৌপথের ভূমিকা বহু পুরনো। আর নৌপথে চলাচলকারী যাত্রী ও পণ্য ওঠানামার জন্য যেহেতু নদীতীরেই যুতসই স্থান ও স্থাপনার প্রয়োজন পড়ে, তাই এ অঞ্চলে নদীবন্দরের ইতিহাসও নতুন নয়। বাংলায় প্রথম নদীবন্দরের উল্লেখ পাওয়া যায় গ্রিক পণ্ডিত টলেমির মানচিত্রে, যেটাকে তিনি তমলিটিস নামে চিত্রিত করেছেন। অনেকের মতে, বাংলার তাম্রলিপ্তি বা তাম্রলিপ্ত বন্দরেরই আরেক নাম এটি। বন্দরটির অবস্থান নিয়ে বিস্তর বিতর্ক থাকলেও পশ্চিমবঙ্গের মেদিনিপুর জেলায় বঙ্গোপসাগরের নিকটবর্তী রূপনারান নদীর মোহনায় অবস্থিত তমলুকই যে সেই প্রাচীন তাম্রলিপ্তি সে ব্যাপারে মোটামুটি মতৈক্য রয়েছে। এছাড়া সরস্বতী নদীর মোহনায় অবস্থিত সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁও ও কর্ণফুলী নদীর মোহনায় চট্টগ্রাম বন্দরও বেশ প্রাচীন এবং মধ্যযুগেই এগুলোর সুনাম বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। বন্দরগুলো নদীর মোহনায় গড়ে উঠলেও এগুলো ছিল মূলত সামুদ্রিক যোগাযোগের কেন্দ্র, যা সমুদ্রবন্দর হিসেবে বেশি পরিচিতি পায়।

মধ্যযুগে সোনারগাঁ নামে সমৃদ্ধ একটি নদীবন্দরের বর্ণনা পাওয়া যায় মরক্কোর পণ্ডিত ও পরিব্রাজক ইবনে বতুতার বয়ানে। সুলতানি আমলে বাংলা ভ্রমণকালে চট্টগ্রাম বন্দর হয়ে নদীপথে এই বন্দরেই উপস্থিত হয়েছিলেন তিনি। অষ্টাদশ শতকে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রশাসনিকভাবে কলকাতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং কলকাতা ও হুগলিতে গড়ে ওঠা বন্দরগুলোর সাথে পূর্ব বাংলার বাণিজ্যের প্রয়োজনে নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর, বরিশাল, মাদারীপুর, খুলনা ও গোয়ালন্দ নদীবন্দরেরও গুরুত্ব বেড়ে যায়। তবে আসামের সাথে যোগাযোগে সিরাজগঞ্জ ও চিলমারি বন্দরের গুরুত্বও কম ছিল না। উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে বাষ্পচালিত নৌযানের পরিসর বাড়লে যাত্রী ও পণ্য ওঠানামার প্রয়োজনেই নদীবন্দরের চাহিদা বাড়তে থাকে। এখনো এই ধারা অব্যাহত।

বর্তমানে সরকারের গেজেটভুক্ত নদীবন্দরগুলোর অন্যতম হলো টঙ্গী নদীবন্দর, যার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)। নদীবন্দরটির প্রথম গেজেট প্রকাশিত হয় ১৯৬০ সালে। ওই বছরের ১২ সেপ্টেম্বর গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর পোর্টস অ্যাক্ট, ১৯০৮ এর সেকশন ৩ এর ক্লজ ৯ এর সাব-সেকশন ৭ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ইস্ট পাকিস্তান ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট অর্ডিন্যান্স, ১৯৫৮ এর সেকশন ৩ এর আওতায় টঙ্গী নদীবন্দরের কর্তৃত্ব পূর্ব পাকিস্তান অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষের (ইপিডব্লিউটিএ) কাছে ন্যস্ত করেন। ১৯৬০ সালের ১ সেপ্টেম্বর থেকে এ আদেশ কার্যকর বলে গেজেট নোটিফিকেশনে উল্লেখ করা হয়।

সেই সাথে পোর্টস অ্যাক্ট, ১৯০৮ এর সেকশন ৪ এর সাব-সেকশন ২ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নদীবন্দরের সীমানাও নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। সেই সময় পূর্বদিকে বন্দরের সীমানা ধরা হয় টঙ্গী গ্রামের ময়মনসিংহ রোড সেতুর পূর্ব প্রান্তের প্রাচীরের পূর্বদিক থেকে টঙ্গী নালার দক্ষিণ তীরের ২ মাইল পর্যন্ত। পশ্চিম দিকে সীমানা ধরা হয় সেতুর পশ্চিম দিকের প্রাচীরের পশ্চিম প্রান্ত থেকে টঙ্গী নালার দক্ষিণ তীর বরাবর ২ মাইল পশ্চিমে। এছাড়া শুরুতে উত্তর দিকের সীমানা ছিল স্বাভাবিক স্রোতের সময় টঙ্গী নালার উত্তর তীর বরাবর হাই ওয়াটার মার্ক থেকে ৫০ গজ পর্যন্ত। আর দক্ষিণ দিকের সীমানা ছিল টঙ্গী নালার দক্ষিণ তীর বরাবর হাই ওয়াটার মার্ক থেকে ৫০ গজ পর্যন্ত। এর প্রায় সাড়ে চার দশক পরে টঙ্গী বন্দরের সীমানা পুনর্নির্ধারণ করে ২০০৪ সালের ১৯ অক্টোবর গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে বাংলাদেশ সরকার।

কয়েক বছর ধরেই অভ্যন্তরীণ নদীবন্দরটি দিয়ে যাত্রী ও পণ্য পরিবহন ধারাবাহিকভাবে বাড়ছে। ২০১০-১১ অর্থবছরে টঙ্গী নদীবন্দর দিয়ে ২০ লাখ ৯ হাজার যাত্রী পরিবহন হলেও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে তা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ২৩ লাখে। তবে কোভিড-১৯ মহামারির কারণে একটা লম্বা সময় পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ নৌপথে নৌযান চলাচল বন্ধ থাকায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে যাত্রী পরিবহন ১৭ লাখ ২৪ হাজারে নেমে আসে।

একইভাবে ২০১০-১১ অর্থবছরে টঙ্গী নদীবন্দর দিয়ে ৬ লাখ ১৪ হাজার টন কার্গো পরিবহন হলেও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে তা ৯ লাখ টনের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। কোভিড-১৯ মহামারির মধ্যেও ২০১৯-২০ অর্থবছরে নদীবন্দরটি দিয়ে কার্গো পরিবাহিত হয় সাকল্যে ৯ লাখ ৪১ হাজার টন।

পরিসংখ্যানে টঙ্গী নদীবন্দর

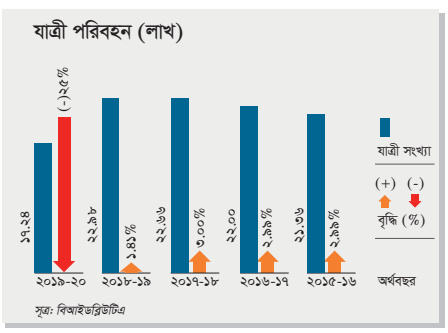

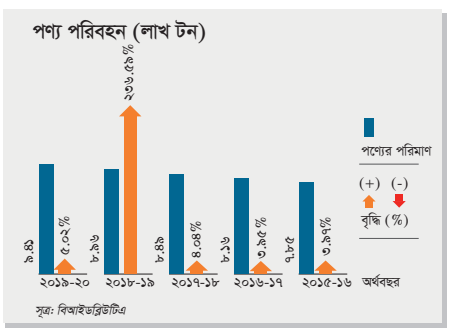

অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন খাতে ডিজিটালাইজেশনের ছোঁয়া »

নদীবাংলা ডেস্ক

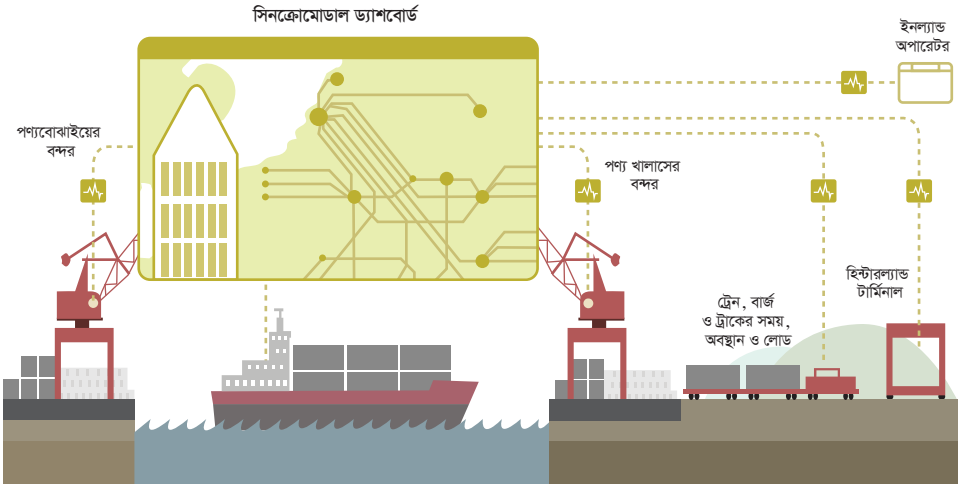

ডিজিটালাইজেশনের প্রভাব পড়েছে কম-বেশি সব খাতেই। বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় পরিবহন ও লজিস্টিক খাতেও ডিজিটাল প্রযুক্তি আত্তীকরণের বিকল্প নেই। এর মধ্য দিয়ে শিপার ও লজিস্টিক সেবাদাতাদের মধ্যকার ব্যবসায় প্রক্রিয়া যেমন গতিশীল হয়, একইভাবে প্রক্রিয়াটি সহজীকরণের মাধ্যমে অনেক বেশি দক্ষ ও কার্যকরও হয়ে ওঠে। পরিবহনের অনেক মাধ্যম এরই মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ইন্টেলিজেন্ট ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমের ব্যবহার শুরু করেছে। অটোনমাস যানের সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে এ খাতেও বিনিয়োগ শুরু হয়েছে। তবে অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এ ধরনের ব্যবস্থা কার্যকরের ক্ষেত্রে বেশকিছু প্রতিবন্ধক রয়েছে। এর মধ্যেও আশার কথা হলো প্রযুক্তিগত উন্নয়ন যে পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে, তাতে করে সেই প্রতিবন্ধকতাও অনেকটাই লাঘব হয়েছে। সরকারি কর্তৃপক্ষগুলো এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর জোগান দিচ্ছে। ইউরোপীয় প্রেক্ষাপটে ডিজিটাল সিঙ্গেল মার্কেট উদ্যোগ ও ডিজিটাল ট্রান্সপোর্ট অ্যান্ড লজিস্টিকস ফোরামের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

তবে ভবিষ্যৎ প্রতিযোগিতার কথা মাথায় রেখে অন্যদেরও এই পথে যাওয়ার বিকল্প নেই। কারণ, অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন খাতকে একদিকে পরিবহনের অন্যান্য মাধ্যমের সাথে প্রতিযোগিতা করতে হচ্ছে, অন্যদিকে মাল্টিমোডাল পরিবহন ইকোসিস্টেমেরও গুরুত্বপূর্ণ অংশ এটি।

অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহনের তিনটি ক্ষেত্রে ডিজিটালাইজেশনের কথা জোরেশোরে আলোচিত হচ্ছে। এর একটি হচ্ছে নৌযান চলাচল ও ব্যবস্থাপনায় আধুনিকায়ন, যাতে নৌযানের জ্বালানি সাশ্রয়ের পাশাপাশি নৌ-অবকাঠামোর সক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত হয়। পরিবহনের অন্যান্য মাধ্যমের সাথে অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহনের সমন্বয়ও প্রয়োজন। তৃতীয়টি হচ্ছে প্রশাসনিক বোঝা কমানো। ইউরোপিয়ান কমিশনের 'ডিজিটাল ইনল্যান্ড ওয়ারটারওয়ে এরিয়া' শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনেও এ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

'ডিজিটাল ইনল্যান্ড ওয়াটারওয়ে এরিয়া (ডিনা)' এমন একটি ধারণা, যা অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন খাতের অবকাঠামো, ব্যক্তি, পরিচালন, নৌযান ও কার্গো সম্পর্কিত তথ্যকে আন্তঃসম্পর্কযুক্ত করে। পরিবহনের অন্যান্য মাধ্যমের সাথেও এই তথ্যের বিনিময় হয়। এজন্য সবার আগে প্রয়োজন একটি প্ল্যাটফরম, যার মাধ্যমে এসব তথ্যের নিয়ন্ত্রিত বিনিময় নিশ্চিত হবে।

ডিজিটাল ইনল্যান্ড ওয়াটারওয়ে এরিয়া বিভিন্ন শ্রেণির অংশীজনের প্ল্যাটফরম, যারা একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। মোটা দাগে এদের তিনটি স্তরে বিভক্ত। প্রথম স্তরে রয়েছে অভ্যন্তরীণ নৌপথ ব্যবহারকারী, যেমন শিপার ও লজিস্টিক সেবাদাতা। দ্বিতীয় স্তরে রয়েছে খোদ পরিবহন খাত, যেমন বার্জ অপারেটর, টার্মিনাল অপারেটর এবং অন্য পরিবহন মাধ্যমের সাথে তাদের সংযোগ। আর তৃতীয় স্তরে রয়েছে কর্তৃপক্ষ অথবা তাদের হয়ে কাজ করা অন্য পক্ষ। কর্তৃপক্ষের কাজ মূলত বিপর্যয় হ্রাসে উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রকাশ এবং চ্যানেলের ব্যবস্থাপনা।

ব্যবস্থাটিতে প্রত্যেক অংশীজনেরই ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য থাকে এবং সেগুলো অর্জনে কিছু বিষয়ের জোগান থাকতে হয়। শিপারের উদ্দেশ্য কম খরচে লজিস্টিক সেবার তালাশ, বুকিং ও তার বাস্তবায়ন এবং শিপমেন্টের সময় কার্গোর উন্নত দৃশ্যমানতা। এজন্য দরকার পড়ে অভ্যন্তরীণ নৌপথে প্রদানকারী লজিস্টিক সেবায় প্রবেশগম্যতা, ডিজিটালি লজিস্টিক সেবা বুকিং দেওয়ার সুবিধা ও কার্গোর অবস্থানগত তথ্য জানা।

লজিস্টিক সেবাদাতাদের উদ্দেশ্যও প্রায় একই রকম। উদ্দেশ্য পূরণে তাদেরও বার্জ অপারেটরদের দেওয়া সেবাসমূহ ও সহজে বুকিং সুবিধার প্রয়োজন পড়ে। বার্জ অপারেটরদের লক্ষ্য থাকে ব্যয়সাশ্রয়ে আরও দক্ষ নেভিগেশন এবং নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানো বা ধরে রাখা। বিদ্যমান বা নতুন গ্রাহকদের আরও বেশি পণ্য পরিবহনও করাও লক্ষ্য থাকে তাদের। সেই সাথে লক্ষ্য থাকে কম পরিশ্রমে কীভাবে সব নিয়ম-কানুন পরিপালন করা যায়। এজন্য প্রয়োজন যতটা দক্ষভাবে সম্ভব যাত্রার পরিকল্পনা করা, যার জন্য চাই ট্রাফিক-সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য। বন্দর বা টার্মিনালে অপেক্ষমাণ সময় কমিয়ে আনার স্বার্থে টার্মিনাল অপারেটরদের সমন্বয়ের সক্ষমতাও থাকতে হবে।

টার্মিনাল অপারেটরদের লক্ষ্য মূলত টার্মিনাল পরিচালনায় দক্ষতা বাড়ানো ও বন্দরে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা উন্নত করা। এজন্য বার্জ অপারেটরের সাথে সমন্বয় সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। আর কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য অভ্যন্তরীণ নৌপথের নিরাপদ ও দক্ষ ব্যবহারে সহায়তা দেওয়া। অন্য মাধ্যমের তুলনায় নৌপথের ব্যবহার বাড়ানোর দিকেও নজর থাকে কর্তৃপক্ষের। এজন্য সবার আগে যেটা দরকার, তা হলো কোনো নির্দিষ্ট করিডোরে বার্জ অপারেটরদের জাহাজ পরিচালনার পরিকল্পনা-সংক্রান্ত অতিরিক্ত উপাত্ত কর্তৃপক্ষের হাতে থাকা।

বিভিন্ন অংশীজনের মধ্যে নানা উপাত্তের ডিজিটাল বিনিময়ের জন্য বেশি ব্যবস্থা ও সেবা চালু আছে। শিপারদের জন্য রয়েছে সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট সলিউশন (এসসিএম)। লজিস্টিক সেবার চুক্তি করতে বৃহৎ শিপার ও লজিস্টিক সেবাদাতারা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে একাধিক বুকিং প্ল্যাটফরম তৈরি করেছে। পরিকল্পনা প্রণয়ন ও শিপমেন্ট ব্যবস্থাপনায় অপারেটরদের জন্য রয়েছে ট্রান্সপোর্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমস (টিএমএস)। বার্জ কল, কার্গো বোঝায় ও খালাস এবং টার্মিনাল পরিচালন-সংক্রান্ত অন্যান্য কাজ সম্পাদনে টার্মিনাল অপারেটরদের জন্য রয়েছে টার্মিনাল অপারেটিং সিস্টেমস (টস)। অনেক নৌযানে ভেসেল ট্র্যাকিং অ্যান্ড ট্রেসিং (ভিটিটি) সিস্টেমও স্থাপন করা হয়েছে। সেই সাথে চ্যানেল পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে আবহাওয়া-সংক্রান্ত উপাত্তও প্রকাশ করছে।

এসব ডিজিটাল সেবার মধ্যে সমন্বয়ে ডিজিটাল ইনল্যান্ড ওয়াটারওয়ে এরিয়ার জন্য প্রয়োজন একটি স্বতন্ত্র ফ্রেমওয়ার্ক, যার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য বিভিন্ন সলিউশন, অংশীজন ও তাদের ডিজিটাল সিস্টেমের মধ্যে আন্তঃনির্ভরশীলতা তৈরি করা।

তবে ডিজিটাল ইনল্যান্ড ওয়াটারওয়ে এরিয়ার রূপরেখা বাস্তবায়নে দুটি বিষয়ের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার সুপারিশ করেছেন গবেষকরা। সুশাসন ও মান ধরে রাখা তার একটি। অর্থাৎ এটি উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুশাসন থাকতে হবে। সেই সাথে ধরে রাখতে হবে মানদণ্ড। এছাড়া পরিবহনের অন্য মাধ্যমগুলোর সাথে এটিকে সাজুয্যপূর্ণও করতে হবে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে ডিজিটাল ইনল্যান্ড ওয়াটারওয়ে এরিয়ার বিভিন্ন উপাদান উন্নয়নে সরকারি-বেসরকারি সহযোগিতা থাকতে হবে। এই সহযোগিতা অর্থায়নের ক্ষেত্রেও হতে পারে।

বাংলাদেশ-ভারত পানিসম্পদ-সংক্রান্ত সহযোগিতা বৃদ্ধিতে জোর

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাম্প্রতিক বাংলাদেশ সফরকালে দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতামূলক সম্পর্কের বিভিন্ন দিক নিয়ে দুই দেশের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। দ্বিপক্ষীয় শীর্ষ বৈঠকে বাংলাদেশ-ভারত পানিসম্পদ-সংক্রান্ত সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয়টিতে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ২৬ থেকে ২৮ মার্চ বাংলাদেশ সফর করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী।

এ সফর নিয়ে দেওয়া যৌথ বিবৃতি অনুযায়ী, তিস্তা নদীর পানিবণ্টন দীর্ঘদিনের বকেয়া অন্তর্বর্তী চুক্তিটি শিগগিরই সম্পাদনের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আবারও উদ্যোগ গ্রহণের অনুরোধ জানিয়েছেন। তিস্তা অববাহিকার ওপর নির্ভরশীল মানুষের জীবনযাত্রা দীর্ঘদিন ধরে সংকটের মধ্যে রয়েছে। বাংলাদেশের জন্য তিস্তার পানির যথাযথ হিস্যা পাওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। এই চুক্তির খসড়া ২০১১ সালে উভয় সরকার গ্রহণ করে।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে নরেন্দ্র মোদি জানিয়েছেন, এই চুক্তি বাস্তবায়নের ব্যাপারে ভারত অঙ্গীকারবদ্ধ। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে শিগগিরই আলোচনা করে এটি রূপায়ন করা হবে।

এছাড়া ছয়টি অভিন্ন নদী মনু, মুহুরি, খোয়াই, গোমতী, ধরলা এবং দুধকুমার নদীর পানিবণ্টনের ক্ষেত্রে উভয় নেতা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে আলোচনা দ্রুত শেষ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি উজানে সুরমা কুশিয়ারা প্রকল্পের কুশিয়ারা নদীর পানিকে সেচের কাজে ব্যবহার করতে রহিমপুর খাল খননের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার ভারতকে অনুরোধ জানিয়েছে, ভারত যেন দ্রুত এ-সংক্রান্ত অনুমতি দেয়। এই প্রসঙ্গে উভয়পক্ষ দ্রুত চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়টিও আলোচনা করেছে। সংশ্লিষ্ট রাজ্য এ নিয়ে রাজ্য সরকারের সাথে আলোচনা চলছে বলে ভারতের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

২০১৯ সালের অক্টোবরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফরের সময় ফেনী নদী থেকে ১ দশমিক ৮২ কিউসেক পানি নেওয়ার বিষয়ে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে একটি অন্তর্বর্তী চুক্তি হয়েছিল। ভারত বাংলাদেশকে এই চুক্তি দ্রুত সম্পাদনের অনুরোধ জানিয়েছে।

গঙ্গা-পদ্মা জলাধার এবং ১৯৯৬ সালের গঙ্গার পানিবণ্টন চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ যাতে গঙ্গার পানির হিস্যা নির্ধারিত পরিমাণে পেতে পারে, সে বিষয়ে একটি যৌথ কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। দুই প্রধানমন্ত্রী এই কমিটিকে দ্রুত এ-সংক্রান্ত প্রতিবেদন তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন।

যৌথ নদী কমিশনের ইতিবাচক অবদানকে উভয় নেতাই স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং দুই দেশের পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব পর্যায়ের আলোচনাটি ফলপ্রসূ হয়েছে বলেও জানান তাঁরা।

বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ অর্থায়নে আশুগঞ্জে নির্মাণাধীন অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার টার্মিনালটির কাজ সম্পন্ন হওয়ার আগ পর্যন্ত ভারত সরকার বিদ্যমান নৌ প্রটোকলের আওতায় পানগাঁও কন্টেইনার পোর্ট অব কল এবং এর বর্ধিত পোর্ট অব কল মুন্সিগঞ্জস্থ মুক্তারপুর কন্টেইনার টার্মিনাল ব্যবহার করে ট্রান্সশিপমেন্ট পণ্য পরিবহনের আগ্রহ প্রকাশ করে আসছে। তবে অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন ইস্যুর কারণে প্রস্তাবটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা পর্যায়ে রয়েছে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ফেনী নদীর ওপর মৈত্রী সেতু উদ্বোধনের কথাও উল্লেখ করেন তার সফরকালে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ প্রসঙ্গে বলেন, ফেনী নদীর ওপর এই সেতু উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে বিশেষত উত্তর-পূর্ব ভারতের সাথে যোগাযোগ ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে দৃঢ় করার বিষয়ে তাঁদের অঙ্গীকার প্রতিফলিত হয়েছে। নতুন এই সেতু দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য ও পর্যটনের প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তুলতে উভয় দেশ একমত হয়েছে।

হালদা নদীকে 'বঙ্গবন্ধু জীববৈচিত্র্য-সমৃদ্ধ ঐতিহ্য হালদা' ঘোষণা

রুইজাতীয় মাছের প্রাকৃতিক প্রজননের আধার হালদা নদীকে 'বঙ্গবন্ধু জীববৈচিত্র্য-সমৃদ্ধ ঐতিহ্য হালদা' ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। ১৮ মার্চ পরিবেশ, বন ও জ লবায়ু পরিবর্তন বিষয়কমন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জীববৈচিত্র্য-বিষয়ক জাতীয় কমিটির প্রথম সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সভায় পরিবেশমন্ত্রী বলেন, এ সিদ্ধান্তের ফলে হালদা নদীতে কার্পজাতীয় মাছের প্রজনন নির্বিঘ্ন, ডলফিন সুরক্ষা, দূষণ কমানোসহ সামগ্রিক জীববৈচিত্র্য ও প্রতিবেশ সংরক্ষণ সহজ করতে প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন, ২০১৭ অনুযায়ী গঠিত জাতীয় জীববৈচিত্র্য কমিটি জীববৈচিত্র্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এলাকা চিহ্নিতকরণ ও ঘোষণার জন্য পরামর্শ প্রদান এবং ঘোষিত এলাকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে নিয়মিত নির্দেশনা প্রদান করবে।

বাংলাদেশের সংবিধানের ১৮ক অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য সরকার দায়বদ্ধ মন্তব্য করে পরিবেশমন্ত্রী বলেন, এছাড়াও জাতিসংঘের জীববৈচিত্র্য সনদের পক্ষ হিসেবে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উপাদানগুলোর টেকসই ব্যবহার, জীবসম্পদ ও সংশ্লিষ্ট জ্ঞান ব্যবহার করে পাওয়া সুফলের সুষ্ঠু ও ন্যায্য হিস্যা বণ্টন এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার আন্তর্জাতিকভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে কাজ করছে।

সভায় মন্ত্রণালয়ের সচিব জিয়াউল হাসান, অতিরিক্ত সচিব (পরিবেশদূষণ নিয়ন্ত্রণ) মো. মনিরুজ্জামান, পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. একেএম রফিক আহাম্মদ, বন অধিদপ্তরের প্রধান বন সংরক্ষক মো. আমীর হোসাইন চৌধুরী, কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, বাণিজ্য এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

পণ্য পরিবহনে নৌপথ উন্নয়নে কাজ করছে সরকার: প্রধানমন্ত্রী »

নির্বিঘ্নে পণ্য পরিবহন নিশ্চিত করতে সরকার বাংলাদেশের নৌপথের উন্নয়নে কাজ করছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২৫ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ মেরিন একাডেমির ৫৫তম ব্যাচের মুজিববর্ষ গ্র্যাজুয়েশন প্যারেডে বক্তৃতাদানকালে এ মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী। গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে অনুষ্ঠানে যোগ দেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'নদীর নাব্য ফিরিয়ে আনার মাধ্যমে নৌপথ আরও উন্নত করতে কাজ করছি আমরা। যাতে করে নির্বিঘ্নে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিকভাবে পণ্য পরিবহন নিশ্চিত হয়। এদিকটাতে আমরা বিশেষ মনোযোগ দিচ্ছি।'

বাংলাদেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। তাছাড়া আমাদের বিশাল সমুদ্রও আছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালেই সমুদ্রসীমা আইন প্রবর্তন করেছিলেন। কিন্তু ১৯৭৫-পরবর্তী সরকারগুলো এ ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ নিইনি। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং বিশাল সমুদ্রসীমা অর্জন করে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজে লাগাতে হবে এটি। তাছাড়া আমাদের বঙ্গোপসাগর খুবই গুরুত্বপূর্ণ চ্যানেল। অনেক বৈশ্বিক বাণিজ্য এখান দিয়েই সম্পন্ন হয়।'

পাসিং আউট ক্যাডেটদের অভিনন্দন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সমুদ্রচারণ বিষয়টা বেশ চ্যালেঞ্জিং, খুব কঠিন একটা দায়িত্ব। কিন্তু দায়িত্বটা পালন করার মতো প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তোমরা কর্মক্ষেত্রে যোগ দেবে। জাতির পিতার হাতেগড়া এই প্রতিষ্ঠানটি প্রায় মুমূর্ষু আবস্থায় তাঁর সরকার পেয়েছিল। তা উন্নত করার জন্য ব্যাপক কর্মসূচিও তাঁর সরকার বাস্তবায়ন করছে।

বিগত ১০ বছরে এই একাডেমির শিক্ষাদান ট্র্যাডিশনাল থেকে ডিজিটালে রূপান্তরিত হয়েছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, যুক্তরাজ্য মার্চেন্ট নেভি ট্রেনিং বোর্ডের স্বীকৃতিসহ অর্জিত হয়েছে নানাবিধ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। একাডেমির নটিক্যাল প্রশিক্ষণকে উন্নততর করার লক্ষ্যে ২০১৯ সালে একাডেমিতে স্থাপন করা হয়েছে 'নেভিগেশন সিমুলেটর'। এ বছরই উন্নততর মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং প্রশিক্ষণের স্বার্থে 'ইঞ্জিন কন্ট্রোল সিমুলেটর' স্থাপনের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অর্থাৎ এই একাডেমিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ আমরা দিতে যাচ্ছি যাতে আমাদের ক্যাডেটরা দেশে ও বিদেশে আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ নিয়ে তাঁদের দায়িত্ব পালন করতে পারেন।

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এমপি এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ মেসবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী অনুষ্ঠানে পাসিং আউট ক্যাডেটদের মাঝে রাষ্ট্রপতি স্বর্ণ পদক এবং বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশন পদক প্রদান করেন।

'দ্বীপবন্ধু মুস্তাফিজুর রহমান জেটি' উদ্বোধন

সন্দ্বীপবাসীর যাতায়াত ও তাদের মালপত্র ওঠানো-নামানোর সুবিধার্থে সন্দ্বীপস্থ ল্যান্ডিং স্টেশনে ৭০০ মিটার দীর্ঘ কংক্রিটের (আরসিসি) জেটি উদ্বোধন করা হয়েছে। নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এমপি ২৯ জানুয়ারি সন্দ্বীপের গুপ্তছড়ায় জেটিটির উদ্বোধন করেন।

প্রতিমন্ত্রী এ সময় বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ আজ উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী দিনবদলের সনদ ঘোষণা করেছিলেন। বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ মনে করে দিন বদলেছে। প্রধানমন্ত্রী শুধু স্বপ্ন দেখান না, তিনি স্বপ্ন বাস্তবায়ন করেন। তাঁর নেতৃত্বে আমাদের টাকায় পদ্মা সেতু হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর কর্মকাণ্ড শুধু দেশে নয়; সমগ্র বিশ্বে প্রশংসিত হচ্ছে। উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বের 'রোলমডেল'।

সন্দ্বীপে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল হলে সন্দ্বীপবাসীর সব দাবি পূরণ হবে বলে জানান নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী। তিনি বলেন, এখানে বিদেশি বিনিয়োগ আসবে।

বিআইডব্লিউটিএ চেয়ারম্যান কমডোর গোলাম সাদেকের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় সংসদ সদস্য মাহফুজুর রহমান মিতা, সন্দ্বীপ উপজেলা চেয়ারম্যান শাজাহান মাস্টার বিএ, ভাইস চেয়ারম্যান মাইনুদ্দিন মিশন এবং পৌর মেয়র মোক্তাদের মাওলা সেলিম।

উল্লেখ্য, সন্দ্বীপের গুপ্তছড়ায় এ জেটির পাশাপাশি পার্কিং ইয়ার্ড, যাত্রীছাউনি, লাইটিং সিস্টেম, রেলিং, সীমান প্রাচীরসহ আনুষঙ্গিক অন্যান্য সুবিধাদিও নির্মাণ করা হয়েছে। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) কাজগুলো সম্পন্ন করেছে। এজন্য ব্যয় হয়েছে প্রায় ৫১ কোটি টাকা।

শীতলক্ষ্যা তীরের অবৈধ স্থাপনা অপসারণ চলবে: নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী

শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে গড়ে ওঠা অবৈধ স্থাপনা অপসারণ এবং সীমানা পিলার স্থাপনসহ প্রকল্পের কাজ চলবে বলে জানিয়েছেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এমপি। ২৮ জানুয়ারি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে 'নারায়ণগঞ্জ নদীবন্দরের নিয়ন্ত্রণাধীন নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর উপজেলায় সিএসডি গুদাম থেকে ডিইপিটিসি পর্যন্ত শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে গড়ে ওঠা অবৈধ স্থাপনা অপসারণ'-সংক্রান্ত বৈঠকে এ কথা বলেন তিনি।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, মেইন সীমানা পিলার স্থাপন করা হবে। জরিপ করার দরকার হলে সিএস নকশা অনুযায়ী সেটি করা হবে। নারায়ণগঞ্জে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের কাছ থেকে জমি ইজারা নিয়ে যারা ইজারার শর্ত ভঙ্গ করেছে, তাদেরকে আইনের আওতায় আনতে হবে, জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে। এক্ষেত্রে সরকার শক্ত অবস্থানে আছে।

বৈঠকে অন্যদের মধ্যে নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের মেয়র সেলিনা হায়াৎ আইভী, বস্ত্র ও পাট সচিব লোকমান হোসেন মিয়া, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী, বিআইডব্লিউটিএ চেয়ারম্যান কমডোর গোলাম সাদেক, প্রকল্প পরিচালক মো. নুরুল আলম এবং নারায়ণগঞ্জের জেলা প্রশাসক মোস্তাইন বিল্লাহ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, ২০১০ সালের ৯ মার্চ থেকে ২০২১ সালের ১২ জানুয়ারি পর্যন্ত নারায়ণগঞ্জ নদীবন্দর এলাকায় ৫ হাজার ২৩৭টি অবৈধ স্থাপনা অপসারণ করা হয়েছে। এছাড়া ২৬০ দশমিক ৪ একর জমি উদ্ধার, ৬৫ লাখ ৫১ হাজার টাকা জরিমানা এবং ৬ কোটি ২২ লাখ ৯৪ হাজার টাকার পণ্য নিলাম করা হয়েছে।

সীমানা পিলার স্থাপন, ওয়াকওয়ে নির্মাণ, বনায়ন, ইকোপার্ক নির্মাণ সংক্রান্ত (২য় পর্যায়) প্রকল্পের মাধ্যমে নারায়ণগঞ্জ নদীবন্দরে মোট ২ হাজার ৪০০টি পিলার স্থাপনের লক্ষ্যে ২০২০ সালের ৫ জুলাই থেকে প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। এর মধ্যে ১ হাজার ১৭৫টি পিলারের লে-আউট প্রদান করা হয়, যার মধ্যে দৃশ্যমান পিলারের সংখ্যা ২৬৬টি, আংশিক নির্মাণাধীন পিলারের সংখ্যা ৬৩১টি এবং বাকিগুলোর কাজ চলমান রয়েছে।

নারায়ণগঞ্জের এনায়েতনগর, গঙ্গাকুল 'ম' খণ্ড এবং একরামপুর মৌজায় ৫৭টি অবৈধ স্থাপনার তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে পাকা আবাসিক ২৭টি, আধাপাকা আবাসিক ১১টি, পাকা দোকান ৭টি, আধাপাকা মার্কেট তিনটি, আধাপাকা দোকানঘর আটটি এবং আধাপাকা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান একটি।

বাংলাদেশ থেকে নৌপথে ভারতে গেল খাদ্যপণ্যের প্রথম চালান »

নৌ-প্রটোকল চুক্তির আওতায় স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে বাংলাদেশ থেকে নৌপথে ভারতে খাদ্যপণ্যের রপ্তানি ১৬ মার্চ শুরু হয়েছে। নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এদিন নরসিংদীর পলাশে অবস্থিত 'প্রাণ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক' এর জেটি থেকে ভারতগামী খাদ্যপণ্যবাহী জাহাজের যাত্রা উদ্বোধন করেন।

প্রতিমন্ত্রী এ সময় বলেন, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে সরকার গুরুত্বপূর্ণ অনেক পদক্ষেপ নিয়েছে। দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে রপ্তানি বাণিজ্যের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিবেশী দেশ ভারতের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্পর্ককে আরও জোরদার করতে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) নৌপথে সরাসরি ভারতে পণ্য রপ্তানিতে যাবতীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ উদ্যোগের ফলে ভারতে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানি বাড়বে। কারণ, নৌপথে পণ্য পরিবহন তুলনামূলক সাশ্রয়ী। তাছাড়া কলকাতাসহ ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোতে খাদ্যপণ্যসহ বাংলাদেশী পণ্যের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর মাহেন্দ্রক্ষণে বাংলাদেশ থেকে ভারতে নৌপথে খাদ্যপণ্যবাহী জাহাজ প্রেরণে সারা পৃথিবীতে অবস্থানরত বাংলাদেশিরা গৌরববোধ করবেন বলে মনে করেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী। তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি ঠিকই কিন্তু মুক্তির লক্ষ্যে এগোতে পারিনি। বঙ্গবন্ধুর সময়ে দেশের অর্থনীতি এগিয়ে যেতে শুরু করেছিল। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর সঠিক নেতৃত্বের অভাবে সবকিছুতেই দেশ পিছিয়ে যায়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে বাংলাদেশের অর্থনীতির ঝুড়ি শুধু ভরে যায়নি, ঝুড়ি ভরে নৌপথে খাদ্যপণ্য রপ্তানি করছি।

বিআইডব্লিউটিএ'র চেয়ারম্যান কমডোর গোলাম সাদেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সংসদ সদস্য মো. আনোয়ারুল আশরাফ, বাণিজ্য সচিব ড. মো. জাফর উদ্দিন, নৌপরিবহন সচিব মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী এবং প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের চেয়ারম্যান আহসান খান চৌধুরী। প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের পক্ষ থেকে জানানো হয়, নৌপথে খাদ্যপণ্যের প্রথম চালান হিসেবে প্রাণ গ্রুপের উৎপাদিত ২৫ হাজার কার্টন লিচি ড্রিংক নরসিংদীর পলাশে অবস্থিত প্রাণ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক থেকে ২৫ ফেব্রুয়ারি রওনা হয়ে কলকাতা বন্দরের টিটি শেডে গিয়ে পৌঁছায়। এই পরিমাণ পণ্য স্থলবন্দর দিয়ে রপ্তানি করলে ২৫টি ট্রাকের প্রয়োজন হতো। ১৯৯৭ সালে ত্রিপুরায় চানাচুর রপ্তানির মাধ্যমে ভারতে প্রাণ গ্রুপের রপ্তানি কার্যক্রম শুরু হয়। ভারতের ২৮টি রাজ্যের সবগুলোতেই এখন পণ্য রপ্তানি করছে প্রাণ।

'জাহাজ নির্মাণ শিল্পে বাংলাদেশের সম্ভাবনা বিপুল'

জাহাজ নির্মাণ শিল্পে বাংলাদেশের বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে উল্লেখ করে নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ এমপি বলেছেন, সরকারের সহযোগিতায় এ খাতের বেসরকারি খাত এগিয়ে এসেছে। জাহাজ নির্মাণ শিল্পকে এগিয়ে নিতে আরও পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

২৩ জানুয়ারি রাজধানীর রমনায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশে (আইইবি) ট্রান্সফরমিং টু আ শিপবিল্ডিং অ্যান্ড এক্সপোর্টিং কান্ট্রি : চ্যালেঞ্জেস ফর বাংলাদেশ' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন তিনি। আইইবির যন্ত্রকৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মোহাম্মদ নাসির উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সংসদ সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মো. মনোয়ার হোসেন চৌধুরী, সংসদ সদস্য ইঞ্জিনিয়ার এ কে এম ফজলুল হক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক এবং আইইবির সাবেক প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুস সবুর, আইইবির প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার মো. নুরুল হুদা, আইইবির ভাইস প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) ইঞ্জিনিয়ার মো. নুরুজ্জামান এবং শিপবিল্ডিং বিশেষজ্ঞ ও থ্রি এঞ্জেল মেরিন লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বুয়েট ও চার্টার্ড ইঞ্জিনিয়ার, নেভাল আর্কিটেক্ট অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট প্ল্যানার অধ্যাপক ইঞ্জিনিয়ার খবিরুল হক চৌধুরী।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত আয়ের দেশে উন্নীত করার রূপকল্প স্থির করে নৌ-পরিবহনসহ ব্যাপকভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। সরকার বদ্বীপ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বঙ্গবন্ধু সাড়ে তিন বছরে দেশের ভিত্তি গড়ে দিয়েছিলেন। '৭৫-পরবর্তী সরকারগুলো দেশকে উল্টোপথে পরিচালিত করে পিছিয়ে দেয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে এগিয়ে নিতে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন।

ছবিতে বিআইডব্লিউটিএ »

জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে বিআইডব্লিউটিএ'র পুষ্পস্তবক অর্পণ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে ১০ জানুয়ারি বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআইডব্লিউটিএ) চেয়ারম্যান কমডোর গোলাম সাদেকের নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন সংস্থাটির কর্মকর্তারা।

বিআইডব্লিউটিএ চেয়ারম্যানের বরিশাল নদীবন্দর পরিদর্শন

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআইডব্লিউটিএ) চেয়ারম্যান কমডোর গোলাম সাদেক ১৯ জানুয়ারি বরিশাল নদীবন্দরের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। নদীবন্দরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এ সময় তাঁর সাথে ছিলেন

বরিশাল বিভাগের ৩১টি নৌপথের নাব্যতা বাড়ানো হচ্ছে

নৌপথকে দক্ষিণাঞ্চলে পরিবহনের প্রধান মাধ্যম উল্লেখ করে বরিশাল বিভাগের ৩১টি নৌপথের নাব্যতা ও অন্যান্য সুবিধা বৃদ্ধি করে টেকসই ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার কথা জানিয়েছেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এমপি। মোংলা বন্দরের ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় ও পায়রা বন্দরের উন্নয়নের কারণে এ অঞ্চলের নৌপথ ব্যবহারে নদীগুলোর গুরুত্ব অনেকে বেড়েছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

১৯ জানুয়ারি বরিশাল সার্কিট হাউসের সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) আয়োজিত 'বরিশাল বিভাগের নদীসমূহের নাব্যতা বৃদ্ধি, জলাবদ্ধতা হ্রাস, জলাভূমি বাস্তু পুনরুদ্ধার, সেচ ও ল্যান্ডিং সুবিধাদি বৃদ্ধি করে নদী ব্যবস্থাপনার সম্ভাব্যতা যাচাই' শীর্ষক সমীক্ষা কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী বলেন, শুধু রাজধানী নয়; পর্যায়ক্রমে দেশের সব নদী অবৈধ দখলদারদের হাত থেকে মুক্ত করা হবে। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও চট্টগ্রামে নদী দখলদারদের উচ্ছেদ অভিযান চলছে। পর্যায়ক্রমে দেশের সব নদীর অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করা হবে। সারা দেশে বিভিন্ন নদীর ৬০ হাজার অবৈধ দখলদার রয়েছে। তাদের মধ্যে ইতোমধ্যেই ২০ হাজার দখলদার উচ্ছেদ করা হয়েছে।

বরিশালের বিভাগীয় কমিশনার ড. অমিতাভ সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বরিশাল সিটি করপোরেশনের মেয়র সেরনিয়াবাত সাদিক আবদুল্লাহ্, বিআইডব্লিউটিএ চেয়ারম্যান কমডোর গোলাম সাদেক, বিআইডব্লিউটিএ ড্রেজিং বিভাগের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী রকিবুল ইসলাম তালুকদার, বরিশালের জেলা প্রশাসক জসীম উদ্দীন হায়দার ও পুলিশ সুপার মারুফ হোসেন, বরিশাল সদরের উপজেলা চেয়ারম্যান সাইদুর রহমান প্রমুখ।

জনাব খালিদ মাহমুদ চৌধুরী কর্মশালায় বলেন, দখলদারদের হাত থেকে নদী দখলমুক্ত করতে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে বেশকিছু যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সব দখলদারকে উচ্ছেদ করা হবে। নদী না বাঁচলে বাংলাদেশ বাঁচবে না। তাই দখলদারদের স্বেচ্ছায় সম্মানের সাথে দখল ছেড়ে দিতে হবে। তা না হলে দখলকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে।

উল্লেখ্য, সরকারের নির্দেশনায় নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিআইডব্লিউটিএ 'বরিশাল বিভাগের নদীসমূহের নাব্যতা বৃদ্ধি, ন্যূনতম জলাবদ্ধতা, জলাভূমি বাস্তু পুনরুদ্ধার, সেচ ও ল্যান্ডিং সুবিধাগুলি বৃদ্ধি করে টেকসই ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক প্রকল্পটি হাতে নিয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল অ্যান্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (সিইজিআইএস) প্রকল্পটির সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করেছে।

প্রকল্পের আওতায় বরিশাল বিভাগের ৩১টি নৌপথ উন্নয়নের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ১ হাজার ৪৭৫ কিলোমিটার। ৩১টি নৌপথের মধ্যে মাত্র চারটি নৌপথে পর্যাপ্ত গভীরতা থাকায় আপাতত ড্রেজিংয়ের প্রয়োজন নেই। অবশিষ্ট নৌপথে খননের প্রস্তাব করা হয়েছে, যার দৈর্ঘ্য প্রায় ৪৭০ কিলোমিটার এবং এর ক্যাপিটাল ড্রেজিংয়ের পরিমাণ প্রায় ৪২ মিলিয়ন ঘনমিটার। পরবর্তীতে নৌপথগুলোর নাব্যতা বজায় রাখার জন্য সাত বছর প্রায় ১৭০ মিলিয়ন ঘনমিটার সংরক্ষণ ড্রেজিংয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে। নতুন ঘাট ও বিদ্যমান ঘাট উন্নয়নের জন্য গৃহীত প্রকল্পের আওতায় তিনটি নতুন লঞ্চঘাট নির্মাণ, ৬০টি লঞ্চঘাট, ১১টি কার্গোঘাট, ৩৮টি খেয়াঘাট উন্নয়ন ও তিনটি ঘাট পর্যটনের জন্য উন্নয়নের প্রস্তাব করা হয়েছে।

সিলেটে নদী রক্ষায় ১০ দফা দাবি

আন্তর্জাতিক নদীকৃত্য দিবসে সিলেটে পরিবেশবাদীদের সমাবেশে নদীর অস্তিত্ব রক্ষায় ১০ দফা দাবি উত্থাপন করা হয়েছে। ১৪ মার্চ দিবসটি উপলক্ষে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) ও সুরমা রিভার ওয়াটারকিপারের যৌথ উদ্যোগে সিলেট নগরীর সুরমা নদীর তীরে চাঁদনীঘাটে আয়োজিত সমাবেশ থেকে এ দাবি জানানো হয়। সমাবেশে বক্তারা বলেন, সিলেটসহ দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের বড় অংশজুড়ে রয়েছে নদী। তাই এই প্রকৃতিকে বাঁচাতে হলে নদী বাঁচাতে হবে। দখল-দূষণের মাধ্যমে নদীকে আমরা প্রতিনিয়ত বিপন্ন করে তুলছি। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষা করতে হলে নদীর অস্তিত্বকে রক্ষা করতে হবে।

অভিন্ন ৬ নদীর পানিবণ্টনে রাজ্যগুলোর সম্পৃক্ততা চায় বাংলাদেশ

অভিন্ন ছয়টি নদীর পানিবণ্টন নিয়ে ভারতের রাজ্যগুলোর সম্পৃক্ততা চেয়েছে বাংলাদেশ। ৬ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত যৌথ নদী কমিশন (জেআরসি) কারিগরি কমিটির ভার্চুয়াল আলোচনায় বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বিষয়টি তোলা হয়।

বৈঠকের তথ্য অনুযায়ী, জেআরসির কারিগরি কমিটির বৈঠকে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে প্রবাহিত ছয়টি অভিন্ন নদীর পানিবণ্টন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। অভিন্ন নদীগুলোর পানিবণ্টন চুক্তির বিষয়ে ভারতের রাজ্যগুলোকে সম্পৃক্ত করতে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ভারতকে অনুরোধ করা হয়। কারণ এসব রাজ্যের সম্মতি নেওয়াও জরুরি। জেআরসির কারিগরি কমিটির বৈঠকে অভিন্ন যে ছয়টি নদীর পানিবণ্টন চুক্তি নিয়ে আলোচনা হয়, সেগুলো হলো খোয়াই, ধরলা, দুধকুমার, মনু, মুহুরী ও গোমতী। এসব নদী ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরা থেকে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এ কারণেই নদীগুলোর পানিবণ্টন চুক্তির জন্য এই তিন রাজ্যের সম্পৃক্ততা চাওয়া হয়েছে।

এর আগে প্রথম দিনের বৈঠকে এই ছয়টি নদীর পানিপ্রবাহের বিস্তারিত তথ্য বাংলাদেশ জানতে চেয়েছিল। বিশেষ করে ভারতে নদীগুলোর কোন অংশে কত পানি রয়েছে, সেটা জানতে চাওয়া হয়। পাশাপাশি বৈঠকে গঙ্গার পানিবণ্টন চুক্তিও পর্যালোচনা করা হয়।

এর আগে গত ১৭ ডিসেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাথে ভার্চুয়াল বৈঠকে তিস্তাসহ অভিন্ন নদীর পানিবণ্টনের বিষয়টি উত্থাপন করেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ওই বৈঠকের পরেই দুই দেশের মধ্যে জেআরসির বৈঠকের প্রক্রিয়ায় গতি আসে। সে অনুযায়ী ৫ ও ৬ জানুয়ারি জেআরসির কারিগরি কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

ছবিতে বিআইডব্লিউটিএ »

পাবনায় নবনির্মিত মেরিন একাডেমি পরিদর্শনে নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এমপি ২৭ ফেব্রুয়ারি পাবনার নগরবাড়ীতে নবনির্মিত বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, পাবনা পরিদর্শন করেন। অন্যান্যের মধ্যে এ সময় উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সংসদ সদস্য শামসুল হক টুকু, সংসদ সদস্য আহমেদ ফিরোজ কবির, সংসদ সদস্য এ এম নাঈমুর রহমান দুর্জয়, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব ও প্রকল্প পরিচালক রফিক আহম্মদ সিদ্দিক, বিআইডব্লিউটিএ'র চেয়ারম্যান কমডোর গোলাম সাদেক, বিআইডব্লিউটিসির চেয়ারম্যান সৈয়দ মো. তাজুল ইসলাম এবং পাবনা মেরিন একাডেমির কমান্ড্যান্ট ক্যাপ্টেন মো. তৌফিকুল ইসলাম।

সংবাদ সংক্ষেপ »

» এনআরসিসির নতুন চেয়ারম্যান আলী কবীর

অবসরপ্রাপ্ত সচিব এ এস এম আলী কবীর জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের (এনআরসিসি) চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছেন। সচিব পদমর্যাদা ও সুবিধা দিয়ে আগামী তিন বছরের জন্য নিয়োগ দিয়ে ১২ জানুয়ারি আদেশ জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। যোগদানের তারিখ থেকে তার এ নিয়োগ কার্যকর বিবেচিত হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী আলী কবীর মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজে ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক হিসেবে চাকরি করেন। কিছুদিন বাংলাদেশ ব্যাংকেও চাকরি করেন তিনি। সরকারের সচিব হিসেবে ২০১১ সালে তিনি অবসরে যান। এ এস এম আলী কবীর হচ্ছেন জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের দ্বিতীয় চেয়ারম্যান।

» বিআইডব্লিউটিএতে এপিএ শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআইডব্লিউটিএ) চেয়ারম্যান কমডোর গোলাম সাদেক ৪ ফেব্রুয়ারি বিআইডব্লিউটিএ'র ১০ গ্রেড ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য আয়োজিত 'বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে এপিএ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। বিআইডব্লিউটিএ প্রধান কার্যালয়ের অডিটোরিয়াম 'মুক্তিযোদ্ধা মিলনায়তনে' এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিআইডব্লিউটিএ'র সদস্য (অর্থ) মো. নূরুল আলম, সদস্য (প্রকৌশল) ড. এ কে এম মতিউর রহমান ও বিভাগীয় প্রধানসহ কর্তৃপক্ষের সকল কর্মকর্তা।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী

» বিআইডব্লিউটিএ'র গণসংগীত ও নৌর‍্যালি আয়োজন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) ৩০ মার্চ গণসংগীত ও নৌর‍্যালির আয়োজন করে। নৌর‍্যালিটি ঢাকার সদরঘাট থেকে শুরু হয়ে গাবতলী গিয়ে শেষ হয়। বিআইডব্লিউটিএ চেয়ারম্যান কমডোর গোলাম সাদেক নৌর‍্যালির নেতৃত্ব দেন।

আরিচা-কাজিরহাট ফেরি সার্ভিস চালু

জনদুর্ভোগ লাঘবে চালু করা হলো আরিচা-কাজিরহাট রুটে ফেরি সার্ভিস। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকীতে দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে যাতায়াতকারী জনসাধারণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর উপহারস্বরূপ নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এমপি ২৭ ফেব্রুয়ারি ফেরি সার্ভিসটির উদ্বোধন করেন।

আরিচা-কাজিরহাট ফেরিরুটের দূরত্ব ১৪ কিলোমিটার। এই রুট দিয়ে যাতায়াতে অর্থাৎ আরিচা থেকে কাজিরহাট যেতে সময় লাগবে ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট এবং কাজিরহাট থেকে আরিচা আসতে সময় লাগবে ১ ঘণ্টা ১০ মিনিট। একটি রো রো (বড়) ফেরি ও দুটি মাঝারি আকৃতির ফেরি দিয়ে এ রুটের সেবা শুরু হয়েছে। রুটটিতে বড় বাসের ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে ২ হাজার ৬০ টাকা। এছাড়া ট্রাকের ১ হাজার ৪০০, মাইক্রোবাসের ১ হাজার, প্রাইভেট কারের (ছোট গাড়ি) ৬৮০, মোটরবাইকের ১০০ এবং যাত্রীর ভাড়া ২৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

আরিচা-কাজিরহাট রুটে ফেরি সার্ভিস উদ্বোধন করে নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এমপি বলেন, প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা দেশের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন। তিনি নির্বাচনী ইশতেহারে ১০ হাজার কিলোমিটার নৌপথ খননের ঘোষণা দিয়েছেন। নদীগুলোকে ড্রেজিং করে নাব্যতা ফিরিয়ে আনা হবে। বঙ্গবন্ধু ছাড়া কোনো নেতা নদী খননের কথা ভাবেননি। নৌপথ খননে বঙ্গবন্ধু সাতটি ড্রেজার সংগ্রহ করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৮ সালের পর ৩২টি ড্রেজার সংগ্রহ করেছেন। আরও ৩৫টি ড্রেজার সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের জন্য বাংলাদেশ জাতিসংঘের চূড়ান্ত স্বীকৃতি লাভ করায় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও বঙ্গবন্ধুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান প্রতিমন্ত্রী। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জাতি হিসেবে আমরা মর্যাদার জায়গায় চলে গেছি। বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে স্বাধীনতার সুখ অনেক আগেই পেতাম। দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সমুদ্রে অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছি। নদীমাতৃক বাংলাদেশকে ধরে রাখার জন্য প্রধানমন্ত্রী বদ্বীপ পরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন।

আরিচা-কাজিরহাট রুটে ফেরি সার্ভিস উদ্বোধন উপলক্ষে পাবনার বেড়ায় কাজিরহাট উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে বিআইডব্লিউটিএ চেয়ারম্যান কমডোর গোলাম সাদেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সুধীসমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংসদ সদস্য শামসুল হক টুকু, সংসদ সদস্য আহমেদ ফিরোজ কবির, সংসদ সদস্য এ এম নাঈমুর রহমান দুর্জয়, সাবেক সংসদ সদস্য খন্দকার আজিজুর রহমান আরজু, পাবনা জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান রেজাউর রহিম লাল, বিআইডব্লিউটিসির চেয়ারম্যান সৈয়দ মো. তাজুল ইসলাম, পাবনার জেলা প্রশাসক কবীর মাহমুদ ও পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মুহিবুল ইসলাম খান।

রূপনগর খাল তুরাগের সাথে সংযুক্ত হবে

রাজধানীর মিরপুর এলাকার রূপনগর খাল তুরাগ নদের সাথে সংযুক্ত করা হবে বলে জানিয়েছেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের মেয়র আতিকুল ইসলাম। খালটি পরিদর্শন শেষে ১৩ জানুয়ারি সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ৬০ ফুট চওড়া খাল ও এর আশপাশের এলাকার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হবে। এর অংশ হিসেবে প্রাথমিকভাবে খালের দুই পাড়ে বৃক্ষ রোপণ করা হবে। পরবর্তীতে সেখানে নির্মাণ করা হবে বাইসাইকেলের জন্য লেন ও ওয়াকওয়ে।

খালটি পরিচ্ছন্ন ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করলে এলাকার বাসিন্দারা উপকৃত হবেন বলে জানান ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের মেয়র। কারণ, মনিপুর স্কুল, মিরপুর কমার্স কলেজসহ বেশ কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আছে এ অঞ্চলে। যাতায়াতের জন্য এখানকার শিক্ষার্থীরা জলপথ ও বাইসাইকেল লেন ব্যবহার করতে পারবেন। খালের দুই পাড়ের অবৈধ স্থাপনা তাই সরিয়ে নিতে সংশ্লিষ্টদের আহ্বান জানিয়েছেন মেয়র। তা না হলে সিটি করপোরেশনের পক্ষ থেকে উচ্ছেদ কর্মসূচি পরিচালনা করা হবে বলে জানিয়ে দেন তিনি।

পদ্মায় চালু হলো 'পদ্মা ক্রুজ'

নৌ ভ্রমণের মাধ্যমে পদ্মা সেতু পরিদর্শনের সুযোগ করে দিতে চালু হয়েছে পদ্মা ক্রুজ। পদ্মা সেতু দৃশ্যমান হওয়ার ৪১তম দিনে ২১ জানুয়ারি এটি উদ্বোধন করা হয়। মুন্সিগঞ্জের শিমুলিয়া ঘাট থেকে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মো. মাহবুব আলী এমপি পদ্মা ক্রুজ উদ্বোধন করেন।

এ সময় তিনি বলেন, নদী পর্যটনে আমাদের অপার সম্ভাবনা। দেশের মানুষ পদ্মা সেতু দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। এ সময় পর্যটন পদ্মা ক্রুজ একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। পর্যটকদের জন্য নদীকেন্দ্রিক প্রয়োজনীয়

ছবিতে বিআইডব্লিউটিএ »

বিআইডব্লিউটিএ চেয়ারম্যান ও ডিএসসিসি মেয়র বৈঠক

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআইডব্লিউটিএ) চেয়ারম্যান কমডোর গোলাম সাদেক ২৭ জানুয়ারি ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) মেয়র শেখ ফজলে নুর তাপসের সাথে নগর উন্নয়নে দ্বিপক্ষীয় আলোচনায় অংশ নেন।

বিআইডব্লিউটিএ'র শর্টকোড ১৬১১৩ উদ্বোধন

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআইডব্লিউটিএ) চেয়ারম্যান কমডোর গোলাম সাদেক ১৭ ফেব্রুয়ারি কর্তৃপক্ষের শর্টকোড ১৬১১৩ উদ্বোধন করেন। জরুরি প্রয়োজনে নৌপরিবহন-সংক্রান্ত তথ্যাদি জানতে ১৬১১৩ নম্বরে কল করা যাবে।

সংবাদ সংক্ষেপ »

» হালদায় বালু উত্তোলনকারী ১৫টি নৌকা জব্দ

চট্টগ্রামের হালদা নদী থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনে নিয়োজিত ইঞ্জিনচালিত ১৫টি নৌকা জব্দ করেছে হাটহাজারী উপজেলা প্রশাসন। ১৬ ফেব্রুয়ারি মহাজনের টেক এলাকায় অভিযান চালিয়ে নৌকাগুলো জব্দ করা হয়। ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের (আইডিএফ) সদস্যদের সাথে নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে নৌকাগুলো জব্দ করার কথা জানান হাটহাজারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রুহুল আমিন। অভিযানে বালু উত্তোলনে ব্যবহৃত অন্যান্য সহায়ক সামগ্রীও বাজেয়াপ্ত করা হয়।

» ঢাকার নদী দূষণরোধে নতুন পয়োশোধনাগার

ঢাকার চারপাশের নদীগুলো দূষণমুক্ত রাখতে রায়েরবাজার এলাকায় ১ হাজার ৯৩৫ কোটি টাকা ব্যয়ে পয়োশোধনাগার নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের রায়েরবাজার, হাজারীবাগ, মোহাম্মদপুর, বসিলা, কল্যাণপুর, শ্যামলী ও তার নিকবর্তী এলাকায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে ঢাকা ওয়াসা।

প্রস্তাবিত প্রকল্পের আওতায় ১ হাজার ৫৭৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫৬ দশমিক ২২ একর ভূমি অধিগ্রহণ করা হবে। এছাড়া ৭০ কোটি টাকা ভূমি উন্নয়ন ও ২১৫ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণে ব্যয় হবে। এছাড়া সীমানা পিলারসহ কাঁটাতারের বেড়াও নির্মাণ করা হবে। ২০২২ সালের ডিসেম্বর নাগাদ প্রকল্পের কাজ শেষ করার লক্ষ্য ধরা হয়েছে।

» পাবনায় ইছামতীর পুনঃখনন শুরু

পাবনার ঐতিহ্যবাহী ইছামতী নদীর অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ ও পুনঃখনন শুরু হয়েছে। পাবনা সদর আসনের সংসদ সদস্য গোলাম ফারুক প্রিন্স ৩০ মার্চ শহরের হাউজপাড়া মোড়ে পুরাতন ব্রিজ এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান ও পুনঃখনন কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। ছোট নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন প্রকল্পের আওতায় পাবনায় ইছামতী নদী পুনঃখনন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে প্রায় ৯ কোটি টাকা ব্যয়ে পৌর এলাকার ৭ দশমিক ৬৭ কিলোমিটার নদীর পাড়ের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ ও নদী খননের কাজ করা হবে।

সব অবকাঠামো উন্নয়নের সরকার সচেষ্ট থাকবে এবং পদ্মা ব্রুজের মতো উদ্যোগ নদী পর্যটনকে আরও বিকশিত করবে।

ঢাকা ব্রুজ অ্যান্ড লজিস্টিকসের উদ্যোগ পদ্মা ব্রুজের মাধ্যমে পদ্মা নদীর প্রবাহে, পদ্মার বিশালতায় পদ্মা সেতু পরিদর্শন করা যাবে। প্রতিদিন নিয়মিত চলবে পদ্মা ব্রুজ। মাওয়া ঘাট থেকে প্রতিদিন ডে ব্রুজ (সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা) ও সন্ধ্যাকালীন ব্রুজ (বেলা ২টা থেকে বিকেল ৫টা) পরিচালিত হবে। তবে আবহাওয়ার ওপর ভিত্তি করে ভ্রমণসূচি পরিবর্তন হতে পারে।

নদীর বেঁচে থাকার অধিকার নিশ্চিত করা সবার দায়িত্ব

উচ্চ আদালত নদীকে জীবন্ত সত্তা হিসেবে ঘোষণা করেছেন। অতএব এই সত্তার ভালোভাবে বেঁচে থাকার অধিকারগুলো নিশ্চিত করা সরকারসহ আমাদের সবার দায়িত্ব। তাছাড়া নদী রক্ষায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বারবার তার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। তাই নদী দখলের ঘটনা তাঁর নজরে আনলেই এগুলো বন্ধ হবে বলে মনে করেন পরিবেশবাদী ও বিশিষ্টজনেরা।

১৪ মার্চ আন্তর্জাতিক নদীকৃত্য দিবস উপলক্ষে এর আগের দিন ১৩ মার্চ ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে সাংবাদিক সাগর-রুনি মিলনায়তনে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা), ওয়াটারকিপার্স বাংলাদেশ, জাতীয় নদী জোট ও জাতীয় নদী রক্ষা আন্দোলন। ওই সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন উপস্থিতরা।

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা সুলতানা কামাল বলেন, প্রাকৃতিক সম্পদের বড় অংশজুড়ে রয়েছে নদী। একে ঘিরেই আমাদের সভ্যতা গড়ে উঠেছে। এমনকি শিল্প-সংস্কৃতিও গড়ে উঠেছে নদীকে কেন্দ্র করেই। তাই এ প্রকৃতিকে আমাদের বাঁচাতে হবে।

আমাদের দেশে নদী রক্ষায় চমৎকার আইন থাকার পরও কেন আমরা নদী রক্ষা করতে পারছি না, সেই প্রশ্ন তোলেন জাতীয় নদী জোটের আহ্বায়ক শারমীন মুরশিদ। তিনি বলেন, নদী উদ্ধার করা হয়, আবার সেগুলো দখল হয়ে যায়। একটি দখলদারকে উচ্ছেদ করতে সারা বছর লেগে যায়। অথচ প্রভাবশালীদের কারণে আবার তা দখল হয়ে যায়। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক ও পরিতাপের বিষয়।

বাপার সাধারণ সম্পাদক ও ওয়াটারকিপারস বাংলাদেশের সমন্বয়ক শরীফ জামিলের সঞ্চালনায় সংবাদ সম্মেলনে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন জাতীয় নদী রক্ষা আন্দোলনের সমন্বয়ক ও বাপার কার্যনির্বাহী সহসভাপতি ডা. মো. আবদুল মতিন। তিনি বলেন, ২০০৮ সালের এক সরকারি গবেষণা মতে, আমাদের দেশে কলকারখানাগুলোই হচ্ছে নদীদূষণের প্রধান উৎস। এসব থেকে নানা রকম বিষাক্ত তরল দূষক পরিবেশের সীমাহীন ক্ষতি সাধন করছে। বিশ্বব্যাপী পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর প্রমাণিত ৯টি জৈব দূষক ১৯৯৮ সালে নিষিদ্ধ হলেও এর সাতটি বাংলাদেশে এখনো ব্যবহার হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী নদী রক্ষায় বারবার তার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন উল্লেখ করে আবদুল মতিন বলেন, আমাদের উচ্চ আদালত নদীকে জীবন্ত সত্তা হিসেবে ঘোষণা করেছেন। অতএব এই সত্তার ভালোভাবে বেঁচে থাকার অধিকারগুলো নিশ্চিত করাও সরকার ও আমাদের সবার দায়িত্ব।

সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে সংবাদ সম্মেলনে বেশকিছু দাবিও তুলে ধরা হয়। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো–উচ্চ আদালতের রায়ের ভিত্তিতে সব নদীর সীমানা নির্ধারণ, নির্মোহভাবে দখলদার উৎখাত ও তা দখলমুক্ত রাখা; নদী নামক জীবন্ত সত্তার অধিকার নিশ্চিত করা; নদীতে 'বাঁধ-ব্যারাজ-রেগুলেটর বসানোর বেষ্টনীনীতি'ভিত্তিক নদী ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম, মৃত ও ভরাট হয়ে যাওয়া নদী খনন করে তার প্রবাহ ও নাব্যতা পুনরুদ্ধার করা, সব শিল্প-কারখানায় বর্জ্য পরিশোধনাগার সংযোজন ও এর বাধ্যতামূলক ব্যবহার নিশ্চিত করা; শহুরে গৃহস্থালি ও হাসপাতাল বর্জ্য নদীতে ফেলা বন্ধ করা ও তরল বর্জ্য পরিশোধন বাধ্যতামূলক করা; নৌযানে নির্গত ময়লা, বর্জ্য, তেল পানিতে ফেলা নিষিদ্ধ করা এবং নৌযানে তেলের পরিবর্তে গ্যাস বা সোলার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা।

উত্তরবঙ্গের নদীগুলোর খনন দ্রুত শেষ করার সুপারিশ

২০২১ সালের মধ্যেই উত্তরবঙ্গের নদীগুলোর খননকাজ শেষ করার সুপারিশ করেছে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি। কমিটির সভাপতি রমেশ চন্দ্র সেনের সভাপতিত্বে ৭ জানুয়ারি সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত সভায় এ সুপারিশ করা হয়। কমিটির সদস্য পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক, ধর্মবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মো. ফরিদুল হক খান, এ কে এম এনামুল হক শামীম এবং সালমা চৌধুরী সভায় অংশ নেন।

উত্তরবঙ্গে (রংপুর বিভাগ) প্রবাহিত নদীগুলোর চলমান খননকাজের অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় সভায়। শুষ্ক মৌসুমকে কাজে লাগিয়ে এ বছরের মধ্যে নদীগুলোর খননকাজ দ্রুত শেষ করার সুপারিশ করা হয়। সভায় সিরাজগঞ্জ এবং জামালপুর জেলার মধ্যে প্রবাহিত যমুনা নদীর প্রবাহের ধরন এবং এ নদীর প্রবাহ ঠিক রাখতে গৃহীত পদক্ষেপ নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়।

পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালকসহ মন্ত্রণালয় এবং সংসদ সচিবালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ছবিতে বিআইডব্লিউটিএ »

৭ মার্চ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উপলক্ষে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআইডব্লিউটিএ) নেতৃত্বে এদিন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তারা।

বিআইডব্লিউটিএ ভবনে জাতির পিতার ভাস্কর্য উন্মোচন

নৌ প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এমপি ২৬ মার্চ বিআইডব্লিউটিএ ভবনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য উন্মোচন করেন। মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী ও বিআইডব্লিউটিএ চেয়ারম্যান কমডোর গোলাম সাদেক এই সময় উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সংক্ষেপ »

» অবৈধভাবে বালু উত্তোলনকারী ১৫ ড্রেজার ধ্বংস

শেরপুরের নালিতাবাড়ী উপজেলার ভোগাই নদীতে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনে নিয়োজিত ১৫টি মিনি ড্রেজার ধ্বংস করেছে উপজেলা প্রশাসন। ২৫ মার্চ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হেলেনা পারভীন এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সঞ্চিতা বিশ্বাস যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে ড্রেজারগুলো ধ্বংস করেন। অবৈধভাবে বালু উত্তোলন বন্ধে আগামীতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা।

» সিরাজগঞ্জে নদী খনন শুরু

সিরাজগঞ্জের বাঙ্গালী, করতোয়া, ফুলজোড় এবং হুরা সাগর নদীর পুনঃখনন শুরু হয়েছে। ৬ ফেব্রুয়ারি সিরাজগঞ্জের নলকা এলাকায় ফুলজোড় নদীর তীরে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব কবির বিন আনোয়ার খননকাজের উদ্বোধন করেন। সিরাজগঞ্জের জেলা প্রশাসক ড. ফারুক আহাম্মদ, পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী শফিকুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালকসহ পানি উন্নয়ন বোর্ডের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে গাইবান্ধা-বগুড়া ও সিরাজগঞ্জ জেলায় বাঙ্গালী, করতোয়া, ফুলজোড় ও হুরা সাগর নদী ড্রেজিং এবং পাড় সংরক্ষণে গৃহীত এ প্রকল্পের আওতায় ২১৭ কিলোমিটার নদীপথ খনন এবং নদীতীর সংরক্ষণ করা হবে। এতে ব্যয় ধরা হয়েছে ২ হাজার ৩৩৫ কোটি টাকা।

» সিসিটিভির আওতায় হালদা নদী

মা-মাছ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার নজরদারির আওতায় আনা হয়েছে দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র মিঠাপানির প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজননক্ষেত্র হালদা নদী। ফেব্রুয়ারিতে হালদা নদীর ৯টি পয়েন্টে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করে নজরদারি শুরু করে নৌ-পুলিশ। হালদার মা-মাছ, আইইউসিএনের লাল তালিকাভুক্ত ডলফিন রক্ষায় এ উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, ২০২০ সালের ২২ ডিসেম্বর সরকার এক প্রজ্ঞাপনে হালদা নদীকে বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ ঘোষণা করে। এর মধ্য দিয়ে নদীটিতে মাছ ধরা, বালি উত্তোলন, পানি প্রত্যাহারসহ মোট ১২টি নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।

» গোমতী থেকে অবৈধ ড্রেজার ও পাইপ জব্দ

কুমিল্লার গোমতী নদীর গোলাবাড়ী সীমান্ত এলাকায় অবৈধভাবে মাটি উত্তোলনকাজে ব্যবহৃত তিনটি ড্রেজার জব্দ ও আনুমানিক দুই হাজার ফুট পাইপ ২৩ মার্চ অপসারণ করেছেন জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট। এছাড়া মাটি পরিবহনের জন্য ব্যবহৃত সংযোগ সড়কও বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। জেলা আনসার ও জেলা পুলিশের একটি দল এ সময় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সহায়তা করে। অভিযানটি পরিচালনা করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট অমিত দত্ত। গোমতী নদী রক্ষায় জেলা প্রশাসন মাসব্যাপী এ অভিযান পরিচালনা করে।

জেআরসির বৈঠকে ফলপ্রসূ আলোচনা »

পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের বিধানসভা নির্বাচনের পর ভারত সরকার তিস্তার পানিবণ্টন চুক্তিসহ বেশকিছু বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে বলে জানিয়েছেন পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব কবির বিন আনোয়ার। দুই দেশের পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব পর্যায়ে বৈঠকের পর ১৭ মার্চ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা জানান। যৌথ নদী কমিশনের (জেআরসি) অধীনে দুই দেশের পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব পর্যায়ের বৈঠক ১৬ মার্চ ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব কবির বিন আনোয়ার। ভারতের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন সে দেশের পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব পঙ্কজ কুমার। বৈঠক থেকে ফিরে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সংবাদ সম্মেলনে কবির বিন আনোয়ার বলেন, সেচের জন্য রহিমপুর পাম্প হাউসে কুশিয়ারার পানি আনা নিয়েও অগ্রগতি হয়েছে বৈঠকে। মহানন্দা নদীর পানিপ্রবাহ কমে আসার পরিপ্রেক্ষিতে একটি যৌথ সমীক্ষা পরিচালনার বিষয়েও বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। সব মিলিয়ে বলা যায়, খুবই ফলপ্রসূ ও ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে।

এর আগে বাংলাদেশ-ভারত সচিব পর্যায়ের বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২০১৯ সালের আগস্টে। গত বছর বৈঠকের জন্য ভারতের পানিসম্পদ সচিবকে আমন্ত্রণ জানানো হলেও কোভিড-১৯ মহামারির কারণে তা পিছিয়ে যায়। অবশেষে ১৬ মার্চ কাঙ্ক্ষিত বৈঠকটি নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হলো।

নদী রক্ষার বিষয়ে দুই দেশই একমত হয়েছে জানিয়ে কবির বিন আনোয়ার বলেন, নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ আগে নিশ্চিত করতে হবে। এরপর আসবে পানিবণ্টনের বিষয়টি। দুই দেশের মধ্যে বোঝাপাড়া যাতে ভালো থাকে সেজন্য সমীক্ষা, পরিদর্শন, উপাত্ত সংগ্রহ সবই করতে হবে যৌথভাবে। ছয়টি অভিন্ন নদীর তথ্য বিনিময়ের প্রক্রিয়াটি চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে বলেও জানান পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব। তিনি বলেন, এ নিয়ে শিগগিরই একটি ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি হবে। ৫৪টি অভিন্ন নদী নিয়েই পর্যায়ক্রমে আলোচনা হবে।

ধরলা নদীর তীর সংরক্ষণ কাজ উদ্বোধন

কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ীতে ৫৪ কোটি ৫০ লাখ ৯০ হাজার টাকা ব্যয়ে আড়াই কিলোমিটার দীর্ঘ ধরলা নদীর বাম ও ডানতীর সংরক্ষণকাজের উদ্বোধন করা হয়েছে। ২১ ফেব্রুয়ারি বিকালে ধরলার তীরবর্তী শিমুলবাড়ী ইউনিয়নের সোনাইকাজী গ্রামে ধরলার তীরে সংসদ সদস্য মো. পনির উদ্দিন আহমেদ তীর সংরক্ষণকাজের উদ্বোধন করেন।

পানি উন্নয়ন বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী, ২০২০ সালের ৩ মার্চ 'কুড়িগ্রাম জেলার কুড়িগ্রাম সদর, রাজারহাট ও ফুলবাড়ী উপজেলার ধরলা নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণসহ ডান ও বামতীর সংরক্ষণ' শীর্ষক প্রকল্পটি জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির সভায় (একনেক) অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয় ৫৯৫ কোটি টাকা। বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্পটির বাস্তবায়নের মেয়াদ ২০২০ সালের ১ মার্চ থেকে ২০২৩ সালের ৩০ জুন। প্রকল্পের আওতায় ধরলা নদীর বাম ও ডানতীরে ১৬ দশমিক ৮৪০ কিলোমিটার তীর সংরক্ষণ, ১৬ দশমিক ৬৬৫ কিলোমিটার বিকল্প বাঁধ নির্মাণ, বামতীরে ১৭ দশমিক ৯০০ কিলোমিটার বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ ও চারটি ঘাটলা নির্মাণসহ বিভিন্ন কার্যক্রম রয়েছে।

ডিএনসিসির ১৩ খাল পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা'

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের (ডিএনসিসি) সম্প্রসারিত ওয়ার্ডগুলোর ১৩টি খাল পুনরুদ্ধারের ঘোষণা দিয়েছেন মেয়র মো. আতিকুল ইসলাম। ২৯ কিলোমিটার দীর্ঘ এসব খালের বিভিন্ন অংশ অবৈধভাবে দখল করা হয়েছে।

ডিএনসিসি মেয়র ২০ জানুয়ারি ভাটারা, সাতারকুল, বাড্ডা এলাকায় (৩৭, ৩৮, ৪০ ও ৪১ নম্বর ওয়ার্ড) সুতিভোলা খাল ও কড্ডা খাল পরিদর্শন শেষে নামাপাড়ায় সাংবাদিকদের এ কথা বলেন।

খাল থেকে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ প্রসঙ্গে মেয়র বলেন, 'সিএস, আরএস, সিটি জরিপ যে দাগে খালের জায়গা বেশি পাওয়া যাবে সে দাগ অনুসারে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হবে। কারণ খাল যত বড় হবে এলাকার পানি তত সহজে নির্গমণ হবে। এ এলাকার রাস্তায় একটু বৃষ্টি

সংবাদ সংক্ষেপ »

» ৪০০ টন কয়লা নিয়ে পশুর নদীতে কার্গোডুবি

পশুর নদীতে ৪০০ টন কয়লাবোঝাই একটি কার্গো জাহাজ ৩০ মার্চ ডুবে যায়। ওই দিন দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে বন্দর জেটির অপর পাশের কাটাখালী নামক এলাকায় জাহাজডুবির ঘটনাটি ঘটে। এ সময় জাহাজটিতে থাকা ৯ জন কর্মী ও একজন নিরাপত্তাকর্মী সাঁতরে তীরে উঠতে সক্ষম হন।

জাহাজটি পশুর চ্যানেলের বাইরে চরের দিকে ডোবায় মূল চ্যানেল নিরাপদ রয়েছে বলে জানিয়েছে বন্দরের হারবার বিভাগ। ডুবে যাওয়া জাহাজটির কয়লা নিয়ে যশোরের নওয়াপাড়ায় যাওয়ার কথা ছিল। জাহাজটির ধারণক্ষমতা ছিল ৫০০ টন। আর কয়লা বোঝাই করা হয়েছিল ৪০০ টন। এর আগে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি রাতে মোংলা বন্দরের পশুর নদীতে ৭০০ টন কয়লা নিয়ে ডুবে যায় এমভি বিবি-১১৪৮ নামক একটি কার্গো জাহাজ।

» নৌযান চলাচল নির্বিঘ্ন করতে পুনর্নির্মাণ হবে ১৩ সেতু

নৌযান যাতে নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারে সেজন্য ঢাকার চারপাশে কম উচ্চতার ১৩টি সেতু ভেঙে নতুন করে নির্মাণ করা হবে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী তাজুল ইসলাম। ৩১ জানুয়ারি ঢাকার চারপাশের নদীগুলোর মহাপরিকল্পনা নিয়ে বৈঠক শেষে এ কথা বলেন তিনি।

স্থানীয় সরকারমন্ত্রী বলেন, ঢাকার চারপাশের নদীগুলোর ওপর নির্মিত কম উচ্চতার ১৩টি সেতু আমরা চিহ্নিত করেছি। নৌযান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে এসব সেতুর উচ্চতা বাড়ানোর বিকল্প নেই। সেতুগুলোর মধ্যে ছয়টি স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের, ছয়টি সেতু বিভাগের ও একটি রেলপথ মন্ত্রণালয়ের।

» মধুমতীর ১২০ একর তীরভূমি উদ্ধার

গোপালগঞ্জে ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান চালিয়ে মুধমতি নদীর তীরবর্তী ১২০ একর সরকারি ভূমি দখলমুক্ত এবং দখলদার ব্যক্তিকে ১০ লাখ টাকা জরিমানা করেছে। উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মনোয়ার হোসেন ২৯ জানুয়ারি সদর উপজেলার মধুমতী নদীর তীরে অভিযান চালিয়ে এই জমি উদ্ধার করেন।

তিনি জানান, দীর্ঘদিন ধরে মধুমতী নদীর তীরে চাপাইল ব্রিজ এলাকায় প্রায় ১২০ একর জমি দখল করে অবৈধভাবে বালি বিক্রি চলছিল। এতে ব্রিজটি হুমকির মুখে পড়েছে।

» দুটি ড্রেজার পাঠিয়েছে এলিকট ড্রেজেস

এলিকট ২০৭০ সিরিজের (২০-ইঞ্চি/৫০০ মিলিমিটার) দুটি ড্রেজার পাঠিয়েছে এলিকট ড্রেজেস। ২০৭০ ড্রাগন সিরিজের ড্রেজারগুলো এলিকটের সর্বাধুনিক ড্রেজার। এর সাহায্যে চ্যানেলের ১৫ মিটার পর্যন্ত খনন করা যাবে। পোতাশ্রয় ও নদী খননের পাশাপাশি ভূমি পুনরুদ্ধার ও স্যান্ড মাইনিংয়েও ব্যবহার করা যাবে এগুলো।

হলেই কোমর পানি হয়ে যায়। এখানে যেসন্ ড্রেন আছে ইতোমধ্যেই সেগুলো পরিষ্কার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রকল্পে ড্রেনগুলো বড় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আতিকুল ইসলাম বলেন, ৪ হাজার ২৫ কোটি টাকার প্রকল্পের অধীনে ২৯ কিলোমিটার খাল পুনরুদ্ধার, পুনঃখনন, পাড় বাঁধাই, সাইকেল লেন, ওয়াকওয়ে ও সবুজায়ন করা হবে।

মেয়র বলেন, এই এলাকার অবকাঠামো উন্নয়নে ইতোমধ্যে ৪ হাজার ২৫ কোটি টাকার একটি প্রকল্প একনেকে পাশ হয়েছে। আমার প্রথম কাজ হচ্ছে এসব এলাকায় রাস্তার পাশে ড্রেন নির্মাণ করা। দ্বিতীয় কাজ রাস্তা চওড়া করা। সরু রাস্তাগুলো অবশ্যই প্রশস্ত করতে হবে।

এই এলাকায় যেন কোনো ধরনের ভবন নির্মাণের প্ল্যান দেয়া না হয় সেজন্য ইতোমধ্যে রাজউককে চিঠি দেওয়া হয়েছে জানিয়ে মেয়র বলেন, কাউন্সিলরদের বলা হয়েছে, এ এলাকায় আর যাতে কোনো বাড়ি না হয়।

'শরীয়তপুরে নদীভাঙন রোধে দ্রুত কাজ করছে সরকার'

বর্ষাকে সামনে রেখে স্বাস্থ্যবিধি মেনে শরীয়তপুরে পদ্মার ভাঙন রোধে নদী খননের মাধ্যমে নদীর গতিপথ পরিবর্তনের কাজ চলছে বলে জানিয়েছেন পানিসম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম। তিনি বলেন, খননের মাধ্যমে স্রোতের গতিপথ পরিবর্তনের ফলে বর্ষায় পদ্মাকে মাঝনদী বরাবর প্রবহমান রাখা সম্পন্ন হবে। এতে করে পদ্মার ডানতীরসহ বামতীরও ভাঙন থেকে রক্ষা পাবে।

১৯ ফেব্রুয়ারি নড়িয়ার মুলফৎগঞ্জ এলাকার খননকাজ পরিদর্শনকালে তিনি এসব কথা বলেন। খননকাজের অগ্রগতি বিষয়ে তিনি বলেন, ড্রেজিং কাজের ৫০ শতাংশ ও ডানতীর রক্ষাবাঁধের ৬০ শতাংশ অগ্রগতি হয়েছে। আশা করছি, এবারের বর্ষায় শরীয়তপুরের পদ্মাপাড়ের মানুষ ভাঙনের হাত থেকে রক্ষা পাবে।

এছাড়া সারা দেশের নদীভাঙনপ্রবণ এলাকার কাজের উল্লেখ করে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে স্থায়ী ভাঙন রোধে স্বাস্থ্যবিধি মেনে করোনা দুর্যোগের আগে থেকে শুরু হওয়া কাজ চলমান রয়েছে। আশা করছি, বিগত ৩০ বছর দেশে নদীভাঙনের যে ভয়াবহ চিত্র ছিল, এ বছর তা আর থাকবে না।

পানি উন্নয়ন বোর্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পূর্ব) কাজী তোফায়েল আহমেদ, প্রধান প্রকৌশলী (পশ্চিমাঞ্চল) মো. আব্দুল হেকিম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ফরিদুপুর সার্কেল) সাহিদুল ইসলাম, শরীয়তপুরের নির্বাহী প্রকৌশলী এস এম আহসান হাবীবসহ প্রকল্পসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা এ সময় তাঁর সাথে ছিলেন।

বাংলাদেশের বিশেষজ্ঞদের রামনগর নদীবন্দর পরিদর্শন

গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও হুগলি নদী ব্যবস্থার প্রয়োগরাজ-হলদিয়া ন্যাশনাল ওয়াটারওয়ে-১ দিয়ে বাংলাদেশে পণ্য পরিবহনের পরিকল্পনায় আরেক ধাপ অগ্রগতি হয়েছে। নৌপথটিতে পণ্য পরিবহনের সম্ভাব্যতা খতিয়ে দেখতে বাংলাদেশের একটি প্রতিনিধি দলের ১৪ ফেব্রুয়ারি রামনগর বিমানবন্দর পরিদর্শনের মধ্য দিয়ে এই অগ্রগতি হলো।

পোর্ট অব কল হিসেবে রামনগর নদীবন্দরকে ব্যবহার করা সম্ভব কিনা সেটা খতিয়ে দেখতে বাংলাদেশ থেকে সাত সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল ১৪ ফেব্রুয়ারি ভারতে যান এবং নদীবন্দরটি পরিদর্শন করেন। নদীবন্দরটিতে বিদ্যমান সব স্থাপনা ও সুযোগ-সুবিধা ঘরে দেখেন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। দেশে ফিরে প্রতিনিধি দলের প্রতিবেদন দাখিল করার কথা, যার ভিত্তিতে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের সদস্যরা রামনগর নদীবন্দরে পৌঁছলে ইনল্যান্ড ওয়াটারওয়েজ অথোরিটিব অব ইন্ডিয়ার (আইডব্লিউএআই) কর্মকর্তারা তাদের স্বাগত জানান। প্রতিনিধি দলটি এর আগে সাহিবগঞ্জ পরিদর্শন করেন।

ইনল্যান্ড ওয়াটারওয়েজ অথোরিটি অব ইন্ডিয়ার (আইডব্লিউএআই) পরিচালক (বারানসি) রাকেশ কুমার এ ব্যাপারে টাইমস অব ইন্ডিয়াকে বলেন, বাংলাদেশ থেকে বর্তমানে জাহাজ আসে কেবলমাত্র কলকাতায়। উভয় দেশের সরকরা সম্মত হলে কাস্টমস ক্লিয়ারেন্সসহ সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা নিয়ে রামনগর নদীবন্দরটি ব্যবহার করা সম্ভব হবে।

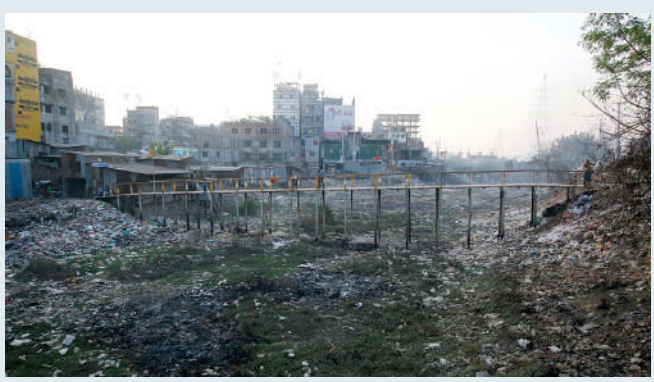

বুড়িগঙ্গার আদি চ্যানেলের ৭৪ স্থাপনা উচ্ছেদের নির্দেশ হাইকোর্টের

ঢাকার হাজারীবাগ ও কামরাঙ্গীরচর এলাকায় বুড়িগঙ্গা আদি চ্যানেলে সিএস বা আরএস জরিপ অনুসারে নদীর জায়গায় চিহ্নিত ৭৪ স্থাপনা, মাটি ভরাট এবং দখল তিন মাসের মধ্যে উচ্ছেদের নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। বিচারপতি গোবিন্দ চন্দ্র ঠাকুর ও বিচারপতি মোহাম্মদ উল্লাহর সমন্বয়ে গঠিত ভার্চুয়াল বেঞ্চ ১৮ মার্চ এক আবেদনের শুনানি শেষে ঢাকার জেলা প্রশাসক ও বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআইডব্লিউটিএ) চেয়ারম্যানের প্রতি এই আদেশ দেন। উচ্ছেদ কাজে সহযোগিতা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পুলিশের মহাপরিদর্শক, র‍্যাবের মহাপরিচালক ও ঢাকা মহানগর পুলিশ কমিশনারকে। আবেদনের পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী মনজিল মোরসেদ। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল অরবিন্দু কুমার রায় ও পরিবেশ অধিদপ্তরের পক্ষে আইনজীবী আমাতুল করীম।

নির্দেশনা বাস্তবায়ন করে ২৬ জুনের মধ্যে ঢাকার জেলা প্রশাসক ও বিআইডব্লিউটিএ চেয়ারম্যানকে আদালতে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে।

ম্যাগপাই নদী এখন জীবন্ত সত্তা »

কানাডার কুইবেক প্রদেশের কোট নর্ড অঞ্চলের ৩০০ কিলোমিটার দীর্ঘ ম্যাগপাই নদীকে জীবন্ত সত্তা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। ইন্নু কাউন্সিল অব ইকুয়ানিতশিত গত ফেব্রুয়ারিতে নদীটিকে এই স্বীকৃতি দিয়েছে।

কানাডায় কোনো নদীকে জীবন্ত সত্তার স্বীকৃতি দেওয়ার ঘটনা এটাই প্রথম। এর উদ্দেশ্য ইন্নু ভাষায় মুতেশেকাও শিপু নামে পরিচিত নদীটিকে পরিবেশগত ক্ষতি থেকে রক্ষার জন্য আদিবাসীদের হাতে নতুন হাতিয়ার তুলে দেওয়া। ইন্নু কাউন্সিল অব ইকুয়ানিতশিতের প্রধান পিয়েতাচো বলেন, নিতাসিনান নামে পরিচিত শান্তিপূর্ণ এই অঞ্চলে স্রস্টা আমাদের রেখেছেন, যার চারপাশ পাহাড় ও নদী দিয়ে ঘেরা। পৃথিবীকে রক্ষার দায়িত্ব যে আপনার ইন্নু জনগোষ্ঠী সবসময়ই স্টো বিশ্বাস করেন। পানিকে তারা জীবন বলে জ্ঞান করে।

ম্যাগপাই নদীর অবস্থান সেন্ট লরেন্স নদীর উত্তরে এবং শক্তিশালী স্রোতের জন্য এটির বিশেষ খ্যাতি রয়েছে। বর্তমানে নদীটির ওপর একটি হাইড্রোইলেক্ট্রিক ড্যাম আছে। তবে নদীটির ওপর এ ধরনের আর কোনো প্রকল্প তৈরির পরিকল্পনা কুইবেকের নেই বলে জানিয়েছে প্রদেশের জ্বালানি কর্তৃপক্ষ।

তা সত্ত্বেও ম্যাগপাই নদী সুরক্ষার বিষয়ে শঙ্কামুক্ত ও আস্থাশীল হতে পারছেন না বলে জানিয়েছেন পিয়েতাচো। তিনি বলেন, নদীটি রক্ষা করা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটা পরীক্ষিত যে, পুরো অঞ্চলকে না হলেও অধিকাংশ অঞ্চলকে বাঁচিয়ে রেখেছে নদীটি।

২০৩০ নাগাদ ২৩টি নৌপথ চালু করতে চায় ভারত

২০৩০ সালের মধ্যে ভারতের ২৩টি অভ্যন্তরীণ নৌপথ চালু করার লক্ষ্যের কথা জানিয়েছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ২ মার্চ এই ঘোষণা দিয়ে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের ভারতের প্রবৃদ্ধির পথক্রমে অংশীদার হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। নরেন্দ্র মোদি বলেন, 'মেরিটাইম খাতের উন্নয়নে ভারত খুবই আন্তরিক এবং সুনীল অর্থনীতিতে বিশ্বের নেতৃস্থানীয় দেশ হতে চাই আমরা।'

'মেরিটাইম ইন্ডিয়া সামিট ২০২১' এ ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে বক্তৃতা দেন নরেন্দ্র মোদি। সেখানে তিনি বলেন, আমাদের সরকার দেশের অভ্যন্তরীণ নৌপথে যে পরিমাণ বিনিয়োগ করছে তা আগে কখনো দেখা যায়নি। অভ্যন্তরীণ নৌপথ একদিকে ব্যয়সাশ্রয়ী, অন্যদিকে পরিবেশবান্ধব পরিবহন মাধ্যম। এসব বিবেচনায় ২০৩০ সালের মধ্যেই আমরা ২৩টি নৌপথে কার্যক্রম চালু করতে চাই।

ভারতের বন্দরগুলোর বার্ষিক পণ্য হ্যান্ডলিং সক্ষমতা ২০১৪ সালের ৮৭ কোটি টন থেকে বেড়ে বর্তমানে ১৫৫ কোটি টনে উন্নীত হয়েছে বলে জানান নরেন্দ্র মোদি। বাদাবান, প্যারাদ্বীপ ও দিনদয়ালে বিশ্বমানের অবকাঠামোসমৃদ্ধ মেগা বন্দর নির্মাণের কাজ চলছে বলেও জানান তিনি।

ভারতের বিস্তৃত উপকূলে ১৮৯টি বাতিঘর আছে জানিয়ে নরেন্দ্র মোদি বলেন, ৭৮টি বাতিঘর-সংলগ্ন এলাকায় আমরা পর্যটন উন্নয়নে কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। এর মূল উদ্দেশ্য-বিদ্যমান বাতিঘর ও সংলগ্ন এলাকার আরও উন্নয়ন করা, যাতে করে তা অনন্য মেরিটাইম পর্যটন স্পট হিসেবে গড়ে ওঠে।

কোচি, গুজরাট ও গোয়ার মতো নগর ও প্রদেশে শহুরে নৌপরিবহন ব্যবস্থা চালুর পদক্ষেপের কথাও ঘোষণা করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, জাহাজ মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন করে বন্দর, জাহাজ ও নৌপথবিষয়ক মন্ত্রণালয় রাখার মধ্য দিয়ে সম্প্রতি মেরিটাইম খাতের আওতা বাড়িয়েছে সরকার। স্থানীয়ভাবে জাহাজ নির্মাণ ও মেরামতেও জোর দেওয়া হচ্ছে। স্থানীয়ভাবে জাহাজ নির্মাণকে উৎসাহিত করতে ভারতীয় শিপইয়ার্ডগুলোর জন্য শিপবিল্ডিং ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্স পলিসির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

বন্দর, জাহাজ ও নৌপথবিষয়ক মন্ত্রণালয় বিনিয়োগযোগ্য ৪০০ প্রকল্প তৈরি করেছে বলে অনুষ্ঠানে অবহিত করেন নরেন্দ্র মোদি। এসব প্রকল্পে ৩ হাজার ১০০ কোটি ডলার বিনিয়োগের সম্ভাবনা আছে বলেও জানান তিনি।

বক্তব্যের শেষদিকে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের উদ্দেশে নরেন্দ্র মোদি বলেন, ভারতের সুদীর্ঘ উপকূল আপনাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে। ভারতের পরিশ্রমী মানুষ আপনাদের অপেক্ষায় আছে। আমাদের বন্দরে বিনিয়োগ নিয়ে আসুন। আমাদের জনগণের মধ্যে বিনিয়োগ করুন। ভারতকে আপনাদের কাঙ্ক্ষিত বাণিজ্য গন্তব্য হওয়ার সুযোগ করে দিন। ভারতের বন্দরকে আপনাদের বন্দর হয়ে ওঠার সুযোগ দিন।

৩১০ কিলোমিটার দীর্ঘ ভেলি-ছাবাকাড় নৌপথ চালু

ভেলি থেকে ছাবাকাড় পর্যন্ত ৩১০ কিলোমিটার দীর্ঘ নৌপথ উদ্বোধন করেছেন কেরালার মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ান। ২ হাজার ৩০০ কোটি রুপি ব্যয়ের প্রকল্পটি ১৫ ফেব্রুয়ারি উদ্বোধন করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী এদিন অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েছে ভেলি থেকে কোলাম পর্যন্ত ৬২ কিলোমিটার স্থানীয় নৌপথ, কোলাম থেকে কোট্টাপ্পুরাম পর্যন্ত ১৬৮ কিলোমিটার জাতীয় নৌপথ ও কোট্টাপ্পুরাম থেকে ছাবাকাড় পর্যন্ত আরও ৮০ কিলোমিটার নৌপথ উদ্বোধন করেন।

কোলাম থেকে কোট্টাপ্পুরাম পর্যন্ত ১৬৮ কিলোমিটার নৌপথকে জাতীয় নৌপথ-৩ হিসেবে নাব্য করা হয়েছে। এর ফলে কোলাম থেকে কোট্টাপ্পুরাম পর্যন্ত করিডোর দিয়ে ৩৫০ থেকে ৫০০ টনের কার্গো ভেসেল চলাচল করতে পারবে। এছাড়া আক্কুলাম থেকে কোলাম পর্যন্ত নৌপথের প্রস্থ ১০-১৫ মিটার এবং এর গভীরতা ১ দশমিক ২ থেকে ১ দশমিক ৫ মিটার।

কেরালা ওয়াটারওয়েজ অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড (কেডব্লিউআইএল) আক্কুলাম থেকে বালাকাড়াভু পর্যন্ত ৬ কিলোমিটার পর্যন্ত নৌপথের কাজ শেষ করেছে। কিন্তু কারিক্কাকমে ২ দশমিক ৭৫ মিটার উঁচু একটি সেতু ধ্বংস করে হাইড্রোলিক ব্রিজ স্থাপনে বিলম্বের কারণে বালাকাড়াভু পর্যন্ত সোলার বোট চলাচল বিঘ্নিত হচ্ছে।

চার দশক পর ইলিশ যাচ্ছে গঙ্গার উজানে

ফারাক্কা বাঁধের কারণে চার দশক ধরে প্রমত্তা গঙ্গার উজানে যাওয়ার সুযোগ নেই বাঙালির অতি প্রিয় ইলিশের। কিন্তু বন্যার হাত থেকে বিহার ও পশ্চিমবঙ্গকে রক্ষায় ও হাইডেল পাওয়ার উৎপাদনের জন্য বাঁধে নতুন একটি নেভিগেশন লক তৈরি করা হচ্ছে। এর ফলে আগামী কয়েক মাসে গঙ্গার উজানে ডিম ছাড়ার সুযোগ পাবে ইলিশ।

জল মার্গ বিকাশ পরিযোজনার অংশ হিসেবে মুর্শিদাবাদ জেলায় নতুন নেভিগেশন লক তৈরির লক্ষ্যে এলঅ্যান্ডটি জিওস্ট্রাকচারের সাথে একটি চুক্তি করেছে ভারতের অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (আইডব্লিউএআই)। প্রকল্পের আওতায় ইলিশের অবাধ চলাচলের একটা ব্যবস্থাও থাকছে।

১৯৭৬ সালে ফারাক্কা নেভিগেশন লক তৈরির ফলে এলাহাবাদ পর্যন্ত গঙ্গায় ইলিশের বিচরণ বন্ধ হয়ে যায়। নতুন নেভিগেশন লক তৈরির ফলে সেই সুযোগ তৈরি হবে। আগামী জুনের মধ্যে নতুন ফারাক্কা নেভিগেশন লক তৈরির কাজ শেষ হবে বলে আশা করছেন এলঅ্যান্ডটি জিওস্ট্রাকচারের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এস কানাপ্পান।

তিনি বলেন, ফারাক্কার বিদ্যমান নেভিগেশন লকের অদক্ষতার কারণে কলকাতা থেকে ২৮০ কিলোমিটার দূরে নতুন একটি নেভিগেশন লক নির্মাণের প্রস্তাব করে আইডব্লিউআইএ। সব গেট যাতে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে পরিচালনা করা যায় সেই ব্যবস্থা থাকবে নতুন নেভিগেশন লকে। প্রকল্পটিতে ব্যয় হচ্ছে ৩৬১ কোটি রুপি।

ইলিশ ডিম ছাড়ার জন্য বর্ষায় বঙ্গোপসাগর থেকে সাধারণত গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও ইরাবতী নদীর দিকে যায়। আরব সাগর, গুজরাটের নদী, পাকিস্তানের সিন্ধু নদী, পারস্য উপসাগর, কৃষ্ণ সাগর ও চীন সাগরেও বিচরণ রয়েছে ইলিশের। সেন্ট্রাল ইনল্যান্ড ফিশারিজ রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ২০১৭ সালের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, উজানের দিকে ইলিশের বিচরণ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে বর্ষায় অর্থাৎ জুলাই-আগস্ট সময়ে এবং অক্টোবর থেকে নভেম্বর পর্যন্ত এটা অব্যাহত থাকে। উজানে ইলিশের স্বাভাবিক বিচরণে সহায়তা করতে ফারাক্কা বাঁধের বিদ্যমান নেভিগেশন চ্যানেলের পশ্চিম দিকে একটি বাইপাস চ্যানেল তৈরির পরামর্শও দেওয়া হয় ওই প্রতিবেদনে।

৪ হাজার কিমি অভ্যন্তরীণ নৌপথ উন্নয়ন করছে ভারত

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে নৌযান চলাচল নির্বিঘ্ন করতে ৪ হাজার কিলোমিটার অভ্যন্তরীণ নৌপথের উন্নয়ন করছে কেন্দ্রীয় সরকার। এ উদ্যোগের ফলে ত্রিপুরা সবচেয়ে বেশি সুবিধাভোগী হবে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় বন্দর, জাহাজ ও নৌপথ-বিষয়ক মন্ত্রী মনসুখ মান্ধব্য।

৭ ফেব্রুয়ারি তিনি বলেন, ত্রিপুরার সোনামুড়ায় গোমতী নদীর ভাসমান জেটি চলতি বছরের মধ্যেই স্থায়ী করা হবে। এজন্য এরই মধ্যে বাজেটে তহবিলও বরাদ্দ করা হয়েছে।

ভারতের সোনামুড়ার সাথে বাংলাদেশের দাউদকান্দিকে সংযুক্তকারী ৯০ কিলোমিটার দীর্ঘ রুটটি গত বছরের মে মাসে ভারত-বাংলাদেশ প্রটোকল রুটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ওই বছরের ৫ সেপ্টেম্বর রুটটি দিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে পণ্য পরিবহনও সম্পন্ন হয়েছে।

মনসুখ মান্ধব্য বলেন, ভারত ও বাংলাদেশ যৌথভাবে প্রটোকল রুটের উন্নয়ন করছে। এজন্য মোট ব্যয়ের ৮০ শতাংশ বহন করছে ভারত। অবশিষ্ট ২০ শতাংশ ব্যয় নির্বাহ করছে বাংলাদেশ।

যুক্তরাষ্ট্রের নৌপথ ও বন্দর অবকাঠামো উন্নয়নে বড় বিনিয়োগ

যুক্তরাষ্ট্রের পুরনো হয়ে যাওয়া অবকাঠামো উন্নয়নে উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। ১ এপ্রিল জো বাইডেনের ঘোষিত ওই পরিকল্পনায় দেশটির অভ্যন্তরীণ নৌপথ, উপকূলীয় বন্দর, স্থলবন্দর ও ফেরিতে বিপুল অংকের বিনিয়োগের কথাও বলা হয়েছে। এসব খাতে অতিরিক্ত ১ হাজার ৭০০ কোটি ডলার বিনিয়োগ প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য কংগ্রেসের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

কীভাবে এ অর্থ ব্যয় হবে, এ ব্যাপারে প্রেসিডেন্টের অগ্রাধিকারইবা কী, সে সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়নি। তবে জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিচ্ছন্ন জ্বালানির বিষয়টি যে এক্ষেত্রে তার অগ্রাধিকারে আছে সেটা পরিষ্কার। প্রেসিডেন্ট তার অভ্যন্তরীণ নৌপথের উদ্যোগে বন্দরের পার্শ্ববর্তী কমিউনিটিগুলোতে বায়ু দূষণ যাতে নিয়ন্ত্রিত থাকে, সে কর্মসূচি নিয়েছেন। প্রেসিডেন্টের এ পরিকল্পনায় বলা হয়েছে, পরিচ্ছন্ন ফ্রেইট ও এভিয়েনে যুক্তরাষ্ট্রকে বৈশ্বিক নেতৃত্বের আসনে স্থাপন করাই এ বিনিয়োগের উদ্দেশ্য।

বাইডেন প্রশাসন যখন অবকাঠামো খাতে বিপুল বিনিয়োগের পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছিল, সে সময় অভ্যন্তরীণ নৌপথকে এ পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করার দাবি তোলেন সংশ্লিষ্টরা। এজন্য বৈশ্বিক বাণিজ্যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা ধরে রাখতে ও জাতীয় অর্থনীতিতে নৌপথের গুরুত্বের কথা বারবার জোর দিয়ে তুলে ধরেন তাঁরা।

গত কয়েক বছরে নৌপথের উন্নয়নে কেন্দ্রীয় তহবিলের আকার যদিও বেড়েছে এবং বেশকিছু প্রকল্পের কাজ শেষও হয়েছে, তারপরও আরও অনেক কিছু করার বাকি আছে বলে দাবি খাত-সংশ্লিষ্টদের। অপেক্ষাকৃত বড় জাহাজ ভেড়ার জন্য এবং অফশোর নবায়নযোগ্য জ্বালানির উন্নয়নের সুযোগ দিতে উপকূলীয় বন্দরগুলোর উন্নয়ন জরুরি বলে মত দেন তাঁরা।

উপকূলীয় নৌযান চলাচলে এসসিআই ও আইডব্লিউএআই চুক্তি

উপকূলীয় নৌযান চলাচলে রাষ্ট্রমালিকানাধীন শিপিং করপোরেশন অব ইন্ডিয়া (এসসিআই) ও ভারতের অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (আইডব্লিউএ) চুক্তি করতে যাচ্ছে। কোম্পানির এক কর্মকর্তা ১৯ জানুয়ারি

আসছে হাইড্রোজেনচালিত অভ্যন্তরীণ নৌযান

হাইড্রোজেনচালিত কার্বনমুক্ত ১০টি অভ্যন্তরীণ নৌযান আনতে যাচ্ছে রটারডামভিত্তিক কোম্পানি ফিউচার প্রুফ শিপিং বিভি (এফপিএস)। আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে নৌযানগুলো আসবে, যেগুলো ভাড়ায় চলবে। পাশাপাশি কোম্পানিটি অভ্যন্তরীণ নৌযান 'মাস' কার্বনমুক্ত হাইড্রোজেন প্রোপালশন ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করতে হল্যান্ড শিপইয়ার্ড গ্রুপের (এইচএসজি) সাথে এরই মধ্যে অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। শতভাগ হাইড্রোজেনচালিত নৌযানটি এ বছরের ডিসেম্বর নাগাদ চলাচল শুরু করবে।

কার্বনমুক্ত করতে নৌযানগুলোর বিদ্যমান অভ্যন্তরীণ কম্বাচশন প্রযুক্তিকে হাইড্রোজেন প্রযুক্তিতে রূপান্তরিত করা হবে। পাশাপাশি প্রধান ইঞ্জিন ও গিয়ারবক্স বদলে ফেলতে হবে এবং নতুন একটি মডিউলার প্রোপালশন সিস্টেম স্থাপন করতে হবে। এতে থাকবে ইলেকট্রিক মোটর, হাইড্রোজেন ট্যাংক, একটি পিইএম সেল সিস্টেম এবং একটি ব্যাটারি সিস্টেম। হাইড্রোজেন ও ফুয়েল সেল সিস্টেম স্থাপন করা হবে নৌযানের কার্গো স্পেসে।

এমনটাই জানিয়েছেন। উপকূলীয় জাহাজ পরিচালনা করবে এসসিআইয়ের সহযোগী প্রতিষ্ঠান ইনল্যান্ড অ্যান্ড কোস্টাল শিপিং লিমিটেড।

বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত এক ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে এসসিআইয়ের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক এইচকে জোশি বলেন, উপকূলীয় জাহাজ চলাচল আমরা শুরু করতে যাচ্ছি। এজন্য আমরা ভারতের অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের সাথে সহযোগিতা ঘোষণা করতে যাচ্ছি। নৌপথ-১ এ কলকাতাভিত্তিক কোম্পানি ইনল্যান্ড অ্যান্ড কোস্টাল শিপিং লিমিটেড এ কার্যক্রম শুরু করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

কনটেইনার করপোরেশন অব ইন্ডিয়া উপকূলীয় জাহাজ চলাচল বন্ধ করার পর এ সম্ভাবনা আরও জোরালো হয়েছে। শিপিংয়ের বিভিন্ন খাতে আগ্রহ রয়েছে এসসিআইয়ের। কোম্পানিটির বহরে রয়েছে অয়েল ট্যাংকার, কনটেইনার জাহাজ এবং যাত্রী ও কার্গো জাহাজ।

এলপিজি পরিবহনে এমওএলের সাথে আইডব্লিউএআইয়ের চুক্তি

অভ্যন্তরীণ নৌপথে এলপিজি পরিবহনে সহায়তা দিতে বিশ্বের বৃহত্তম গ্যাস ক্যারিয়ার এমওএলের সাথে চুক্তি করেছে ভারতের অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (আইডব্লিউএআই)। গত ফেব্রুয়ারিতে চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়টি জানিয়েছে ভারত সরকার।

চুক্তির ফলে বিশ্বের সর্ববৃহৎ গ্যাস ক্যারিয়ার কোম্পানিটি ভারত সরকারের 'মেক-ইন ইন্ডিয়া' উদ্যোগের আওতায় কেবল এলপিজি পরিবহনের বার্জ নির্মাণ ও তা পরিচালনায় বিনিয়োগ করবে। ভারতের বন্দর, জাহাজ চলাচল ও নৌপথ-বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মনুসখ মান্দব্যের উপস্থিতি জাতীয় নৌপথ-১ ও জাতীয় নৌপথ-২ দিয়ে বার্জের মাধ্যমে এলপিজি পরিবহনে আইডব্লিউএআই এবং এমওএল (এশিয়া ওশেনিয়া) পিটিই লিমিটেডের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তির আওতায় আইডব্লিউএআই নাব্য চ্যানেল এবং হলদিয়া, শাহিবগঞ্জ ও বারানসিতে আইডব্লিউএআই টার্মিনাল বা মাল্টিমোডাল টার্মিনালে এলপিজি হ্যান্ডলিংয়ে এমওএলকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবে।

বর্তমানে ভারতের মোট এলপিজির ৬০ শতাংশ সড়কপথে বিভিন্ন গন্তব্যে যায়। এতে খরচ হয় টনপ্রতি ৫ থেকে ৬ রুপি। তবে পরিবহন মালিক-শ্রমিকদের ডাকা ধর্মঘট, সড়ক অবরোধের মতো পরিস্থিতির উদ্ভব হলে এলপিজি পরিবহনে বিলম্ব হয়। এ কারণেই বিদ্যমান পরিবহন ব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে সাশ্রয়ী নৌপথের প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছে কোম্পানিটি। তাছাড়া এটা পরিবেশসম্মতও।

ভারতে প্রথম নদী সংযুক্তিকরণ চুক্তি

বাস্তবায়ন হতে যাচ্ছে ভারতের প্রথম নদী সংযুক্তিকরণ চুক্তি। চার দশক আগে নদী সংযুক্তিকরণের ধারণাটি সামনে এলেও বিশ্ব পানি দিবসে মধ্য প্রদেশ ও উত্তর প্রদেশ সরকারের মধ্যে এ-সংক্রান্ত চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর ফলে মধ্য প্রদেশের কেন নদীর সাথে উত্তর প্রদেশের বেতওয়া নদী সংযুক্ত হবে তা কেন্দ্রীয় পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে।

কেন্দ্রীয় পানিসম্পদমন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত বলেন, পানিবণ্টন নিয়ে উত্তর প্রদেশ ও মধ্য প্রদেশের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা টানাপড়েন শেষে অবশেষে দুই প্রদেশের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও ভার্চুয়ালি অংশ নেন।

কেন-বেতওয়া সংযোগ নদী আন্তঃসংযোগ নিয়ে সরকারের প্রেক্ষিত পরিকল্পনার আওতায় প্রথম প্রকল্প। এর উদ্দেশ্য হলো কেন নদীর কিছু পানি বেতওয়া নদীতে সরবরাহ করা। কেন ও বেতওয়া উভয়েই যমুনার উপনদী। প্রকল্পের তথ্য অনুযায়ী, কেন নদী অববাহিকা থেকে ২ হাজার ৮০০ মিলিয়ন ঘনমিটার পানি বেতওয়া অববাহিকায় জোগান দেওয়া হবে। এজন্য মধ্য প্রদেশের ছাত্তারপুর জেলার দাওধানে কেন নদীর ওপর ৭৩ দশমিক ৮ মিটার উঁচু বাঁধ নির্মাণ করতে হবে। পাশাপাশি একটি খালও কাটা হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে প্রতি বছর ১০ দশমিক ৬২ লাখ হেক্টর জমি সেচের আওতায় আনা সম্ভব হবে। এছাড়া ১০৩ মেগাওয়াট ক্ষমতার জলবিদ্যুৎকেন্দ্রও নির্মাণ করা হবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ৬২ লাখ মানুষের কাছে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে। ৩৫ হাজার ১১১ কোটি ২৪ লাখ রুপি ব্যয়ে প্রকল্পটি সম্পন্ন করতে সময় লাগবে আট বছর।

প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারি বাজপেয়ির আমলে প্রথমবারের মতো নদী সংযুক্তিকরণের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। সেই সময় বলা হয়েছিল, দেশের যেসব অঞ্চলে নদীর পানি পর্যাপ্ত বা প্রয়োজনের তুলনায় বেশি, সেখান থেকে পানি নিয়ে খরাপ্রবণ অঞ্চলগুলোতে পৌঁছে দেওয়া হবে। যদিও বাজপেয়ি সরকারের সময় নদী সংযুক্তিকরণের এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা যায়নি। এবার মোদি সরকার সেটি বাস্তবায়ন করছে।

ভারতে প্রথম নদী সংযুক্তিকরণ চুক্তি

বাস্তবায়ন হতে যাচ্ছে ভারতের প্রথম নদী সংযুক্তিকরণ চুক্তি। চার দশক আগে নদী সংযুক্তিকরণের ধারণাটি সামনে এলেও বিশ্ব পানি দিবসে মধ্য প্রদেশ ও উত্তর প্রদেশ সরকারের মধ্যে এ-সংক্রান্ত চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর ফলে মধ্য প্রদেশের কেন নদীর সাথে উত্তর প্রদেশের বেতওয়া নদী সংযুক্ত হবে তা কেন্দ্রীয় পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে।

কেন্দ্রীয় পানিসম্পদমন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত বলেন, পানিবণ্টন নিয়ে উত্তর প্রদেশ ও মধ্য প্রদেশের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা টানাপড়েন শেষে অবশেষে দুই প্রদেশের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও ভার্চুয়ালি অংশ নেন।

কেন-বেতওয়া সংযোগ নদী আন্তঃসংযোগ নিয়ে সরকারের প্রেক্ষিত পরিকল্পনার আওতায় প্রথম প্রকল্প। এর উদ্দেশ্য হলো কেন নদীর কিছু পানি বেতওয়া নদীতে সরবরাহ করা। কেন ও বেতওয়া উভয়েই যমুনার উপনদী। প্রকল্পের তথ্য অনুযায়ী, কেন নদী অববাহিকা থেকে ২ হাজার ৮০০ মিলিয়ন ঘনমিটার পানি বেতওয়া অববাহিকায় জোগান দেওয়া হবে। এজন্য মধ্য প্রদেশের ছাত্তারপুর জেলার দাওধানে কেন নদীর ওপর ৭৩ দশমিক ৮ মিটার উঁচু বাঁধ নির্মাণ করতে হবে। পাশাপাশি একটি খালও কাটা হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে প্রতি বছর ১০ দশমিক ৬২ লাখ হেক্টর জমি সেচের আওতায় আনা সম্ভব হবে। এছাড়া ১০৩ মেগাওয়াট ক্ষমতার জলবিদ্যুৎকেন্দ্রও নির্মাণ করা হবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ৬২ লাখ মানুষের কাছে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে। ৩৫ হাজার ১১১ কোটি ২৪ লাখ রুপি ব্যয়ে প্রকল্পটি সম্পন্ন করতে সময় লাগবে আট বছর।

প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারি বাজপেয়ির আমলে প্রথমবারের মতো নদী সংযুক্তিকরণের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। সেই সময় বলা হয়েছিল, দেশের যেসব অঞ্চলে নদীর পানি পর্যাপ্ত বা প্রয়োজনের তুলনায় বেশি, সেখান থেকে পানি নিয়ে খরাপ্রবণ অঞ্চলগুলোতে পৌঁছে দেওয়া হবে। যদিও বাজপেয়ি সরকারের সময় নদী সংযুক্তিকরণের এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা যায়নি। এবার মোদি সরকার সেটি বাস্তবায়ন করছে।

সর্ববৃহৎ অভ্যন্তরীণ নৌযান নামাল চীন

সেন্ট্রাল চায়না লজিস্টিক অভ্যন্তরীণ

নৌপথে চলাচলের জন্য সর্ববৃহৎ কনটেইনার জাহাজ চালু করেছে। উহান ও সাংহাইয়ের ইয়াংসান রুটে চলাচল করবে জাহাজটি।

হানহাই ৫ নামের কনটেইনার জাহাজটির দৈর্ঘ্য ১৩৯ দশমিক ৮ মিটার ও প্রস্থ ১১ দশমিক ৫ মিটার। উহান ও সাংহাইয়ের মধ্যে চলাচলকারী এটিই সর্ববৃহৎ কনটেইনার জাহাজ। এর কনটেইনার ধারণক্ষমতা ১ হাজার ১৪০ টিইইউ। সেন্ট্রাল চায়না লজিস্টিকসের মুখপাত্র জু বিয়াউ বলেন, সেবাটি ইয়াংজি ও ইয়াংজি বদ্বীপের মধ্যে সংযুক্তকে উন্নত করবে।

উহান ও জাপানের মধ্যে চলাচলের জন্য ৫০০ টিইইউ ধারণক্ষমতার আরও দুটি কনটেইনার জাহাজ আনার পরিকল্পনা করছে সেন্ট্রাল চায়না লজিস্টিকস। এজন্য ১৬ কোটি ওয়ান বিনিয়োগের পরিকল্পনা করছে কোম্পানিটি।

ব্যর্থ হওয়ার পথে বারানসি-কলকাতা নৌ-চলাচল

গঙ্গা নদী দিয়ে পাটনা থেকে কলকাতা ও বারানসিতে বহুল আলোচিত অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন ব্যর্থ হতে চলেছে। এর কারণ মূলত নৌপথে পাটনা থেকে বারানসি পৌঁছাতে সড়ক ও রেলপথের তুলনায় অত্যধিক বেশি সময় নেওয়া।

ভারতের অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের জাহাজ এমভি আরএন টেগর এক কনটেইনার সার নিয়ে বারানসি ছাড়ে ২৯ ডিসেম্বর। এরপর পাটনার গাইঘাট টার্মিনালে পৌঁছায় ২ জানুয়ারি। অর্থাৎ পাটনা থেকে

বারানসি পৌঁছাতে জাহাজটি সময় নেয় প্রায় পাঁচ দিন।

একাধিক কারণে গন্তব্যে পৌঁছাতে দীর্ঘ সময় নিয়ে ফেলে অভ্যন্তরীণ নৌযানটি। নৌরুটটি জুড়ে একাধিক পিপা ব্রিজ এর প্রধানতম কারণ। এই পিপা ব্রিজ বা পিপা পুল গঙ্গায় বাধাহীন নৌযান চলাচলের প্রতিবন্ধক বলে জানান অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের একজন কর্মকর্তা। তার কথায়-সড়ক বা রেলপথের চেয়েও নৌপথে কার্গো পরিবহনে বেশি সময় লাগছে। ব্যবসায়ীরা তাহলে নৌপথে পণ্য পরিবহন কেন করবেন?

ওই কর্মকর্তার মতে, গঙ্গা নদীর এই রুট দিয়ে নৌযান চলাচলকে উৎসাহিত করা ভালো পদক্ষেপ নয়। কারণ, এতে নির্ধারিত কার্গোর গন্তব্যে পৌঁছাতে দীর্ঘ সময় লাগে। অর্থাৎ পুরো প্রক্রিয়াটি সময়সাপেক্ষ এবং স্বাস্থ্যকর কিছু নয়।

নৌপথে বারানসি থেকে কলকাতায় কার্গো পৌঁছাতে দুই দিনের মতো লেগে গেলেও একই পণ্য ট্রাকে পরিবহন করলে সময় নেয় ২৪ ঘণ্টা। একই দূরত্ব পাড়ি দিতে ট্রেনের লাগে ১৩ থেকে ১৫ ঘণ্টা। এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়ে বেসরকারি কোম্পানি এমনকি লজিস্টিকস খাতও এই রুটে নৌযানের প্রতি খুব একটা আগ্রহ দেখাচ্ছে না। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, সরকারের তরফ থেকে যেমনটা দাবি করা হচ্ছে, তার চেয়ে অনেক কম নৌযান, বলতে গেলে মাত্র কয়েকটি নৌযান পাটনা হয়ে বারানসি থেকে কলকাতা রুটে চলাচল করছে।

কলকাতা থেকে বারানসিতে অভ্যন্তরীণ নৌপথে পৌঁছানো দেশের প্রথম কনটেইনার জাহাজটি দুই বছরের বেশি সময় আগে ২০১৮ সালে ১২ নভেম্বর স্বাগত জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কেন্দ্রীয় পরিবহনমন্ত্রী নীতিন গড়করি এরপর বলেছিলেন, পণ্য পরিবহনের খরচ ও ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে রেল ও সড়কপথের ওপর চাপ কমানোর পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের।

উল্লেখ্য, গঙ্গা-ভাগিরথী-হুগলি নদী ব্যবস্থার এলাহাবাদ থেকে হলদিয়া পর্যন্ত নৌপথকে ১৯৮২ সালের আইন অনুযায়ী জাতীয় নৌরুট-১ ঘোষণা করা হয়। ১৯৮৬ সালের ২৭ অক্টোবর অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ গঠিত হওয়ার পর নৌরুটটির কার্যক্রম শুরু হয়। হলদিয়া থেকে এলাহাবাদ পর্যন্ত নৌরুটটির দূরত্ব ১ হাজার ৬২০ কিলোমিটার।

পশ্চিমবঙ্গের নৌপথ উন্নয়নে বিশ্বব্যাংকের ঋণসহায়তা

পশ্চিমবঙ্গের অভ্যন্তরীণ নৌ-চলাচল অবকাঠামো উন্নয়নে ১০ কোটি ৫০ লাখ ডলার ঋণ দিচ্ছে বিশ্বব্যাংক। এ নিয়ে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার ও

বিশ্বব্যাংকের মধ্যে একটি চুক্তি সই হয়েছে। এই অর্থে নেওয়া ওয়েস্ট বেঙ্গল ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট, লজিস্টিকস অ্যান্ড স্পেশাল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের মাধ্যমে হুগলি নদীতে যাত্রী ও পণ্য পরিবহন সহজ করা হবে। পাশাপাশি রাজ্যের লজিস্টিক খাতের প্রবৃদ্ধিতেও ভূমিকা রাখবে প্রকল্পটি।

কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব ড. সিএস মহাপাত্র বলেন, যাত্রী ও পরিবহনে অভ্যন্তরীণ নৌপথ ক্রমেই ব্যয়সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব মাধ্যম হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে।

জলবায়ু পরিবর্তন দীর্ঘমেয়াদে নদীর প্রবাহ বদলে দিচ্ছে »

নদীতে পানির প্রাপ্যতা নির্ভর করে জলবায়ু পরিবর্তনের ওপর। এই আপ্ত বাক্যটা এখন আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি বাস্তব। ১২ মার্চ পিয়ার রিভিউড জার্নাল সায়েন্সে প্রকাশিত আন্তর্জাতিক গবেষকদের একটি গবেষণা অন্তত তা-ই বলছে।

পৃথিবীর নদীগুলোতে পানির পরিমাণকে পানি ও ভূমি ব্যবস্থাপনার মতো বিষয়গুলোও প্রভাবিত করে। তবে জলবায়ু পরিবর্তনই এক্ষেত্রে প্রধান নিয়ামক বলে দাবি গবেষকদের। গবেষণাটির সহ-লেখক মিশিগান স্টেট ইউনিভার্সিটির শিক্ষক ইয়াদু পোখরেলের কথায়-জলবায়ু পরিবর্তন যেহেতু নদীর প্রবাহকে চরম পর্যায়ে নিয়ে যেতে ভূমিকা রাখে, তাই স্বাভাবিকভাবেই এটি কখনো বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি করে কখনো আবার শুকনো মৌসুমে পানির ঘাটতি বাড়িয়ে তোলে।

নদীতে পানি কতটা থাকবে তা অনেকটা পানিচক্রে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ বা ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তনের ওপর নির্ভর করে। উদাহরণ হিসেবে গবেষকরা বলেন, সেচকাজে ব্যবহার বা সংরক্ষণাগারের যদি পানিকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় অথবা বনভূমি উজাড় করে সেখানে মনোকালচার হয়, তাহলে এর মাধ্যমে নদীর প্রবাহ প্রভাবিত হয়ে থাকে।

এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে গবেষক দল ১৯৭১ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত সময়কালের ৭ হাজার ২৫০টি স্টেশনের তথ্য বিশ্লেষণ করেছে। ৯টি বৈশ্বিক হাইড্রোলজিক্যাল মডেলের কম্পিউটার সিমুলেশনও বিশ্লেষণ করেছেন তারা। এরপর তারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, মনুষ্য সৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশ্বব্যাপী নদীর গড় প্রবাহ দীর্ঘমেয়াদে বদলে গেছে। একই কারণে বদলেছে শুকনো মৌসুমে প্রবাহও।

আরও বেশকিছু বিষয় সামনে এনেছে গবেষণাটি। উদাহরণ হিসেবে, ভূমধ্যসাগর এবং উত্তর ব্রাজিলের মতো কিছু অঞ্চলের নদী শুকিয়ে গেছে। আবার স্ক্যান্ডিনেভিয়ার মতো অঞ্চলের নদীর পানির প্রবাহ বেড়েছে। পোখরেল বলেন, প্রতি বছরই নদীতের পানির প্রবাহ বদলাতে পারে। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে প্রবাহ বৃদ্ধি বা হ্রাস মনুষ্যসৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তন ছাড়া সম্ভব নয়। বিশ্বব্যাপী নদীর প্রবাহে পরিবর্তনের বিষয়টি আগের বিভিন্ন গবেষণাতেও দেখা গেছে। তবে কারণটা ছিল অজানা। নতুন এ গবেষণায় এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, গত তিন দশকে জলবায়ুর যে পরিবর্তন, তার কারণেই মূলত নদীর প্রবাহ প্রতি বছর বা শুকনো মৌসুমে বদলে যায়। এর অর্থ-জলবায়ু পরিবর্তনের এ ধারা যত অব্যাহত থাকবে, আমরাও তত বেশি করে পানির প্রবাহ হারাতে থাকব। এর চূড়ান্ত পরিণতি হিসেবে আমাদের পানের জন্য এবং শিল্প, বিদ্যুৎ ও খাদ্যশস্য উৎপাদনের প্রয়োজনীয় পানির সরবরাহ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

কিল্লা আওরঙ্গবাদ: বুড়িগঙ্গাকে আশ্রয় করে প্রাসাদ দুর্গ »

ঢাকার নিরাপত্তায় একাধিক নৌ-দুর্গের পাশাপাশি তিনটি প্রাসাদ দুর্গও নির্মাণ করেন মুঘল শাসকরা। বুড়িগঙ্গার তীরে কিল্লা আওরঙ্গবাদ বা লালবাগের দুর্গ ছিল চার স্তরের নিরাপত্তা কৌশলের অন্যতম অংশ।

নদীবাংলা ডেস্ক

বাংলার ইতিহাস বহু প্রাচীন হলেও নগরকেন্দ্র হিসেবে ঢাকার পরিচিতি খুব পুরনো নয়। যদিও বাংলায় 'দাবাকা' নামে একটি স্থানের উল্লেখ আছে সমুদ্রগুপ্তর (চতুর্থ খ্রিস্টাব্দ) 'এলাহাবাদ প্রশস্তি'তে। অনেকের মতে, ঢাকায় বসতি স্থাপন সম্পর্কে এটাই সবচেয়ে প্রাচীন দলিল। এরপর সপ্তম খ্রিস্টাব্দে এসে কামরূপের বৌদ্ধ সাম্রাজ্যের অধীনে ঢাকায় ছোট ছোট শহুরে স্থাপনা গড়ে ওঠে। নবম খ্রিস্টাব্দের পর ঢাকা ছিল বিক্রমপুরের সেন রাজাদের অধীনে।

ইউরোপীয়দের বয়ানে সেই সময় ঢাকার পরিচিতি ছিল বাঙ্গালা হিসেবে। বলা হয়ে থাকে, সেটা ছিল দুলাই নদীর পাড়ে গড়ে ওঠা 'বায়ান্ন বাজার, তেপান্ন গলি'র ছোট্ট শহর। কালের পরিক্রমায় নানা শাসকের করতলে এসেছে ঢাকা। মুঘল শাসনের আগ পর্যন্ত ১২৯৯ থেকে ১৬০৮ সাল পর্যন্ত ঢাকার নিয়ন্ত্রণ ছিল তুর্কি ও পাঠানদের হাতে। এরপর সোনারগাঁর শাসকদের হাত ঘুরে আসে মুঘল শাসনের অধীনে। বাংলার প্রথম মুঘল ভাইসরয় সুবেদার ইসলাম খাঁ ১৬১০ সালে তাঁর রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় সরিয়ে আনেন এবং এর নতুন নাম দেন জাহাঙ্গীরনগর। সেই সাথে সুবাহ-বাংলার রাজধানী হিসেবে ঢাকার গুরুত্বও অনেক বেড়ে যায়। মুঘল সাম্রাজ্যের বড়সড় রাজস্বের জোগানদাতা সুবাহ-বাংলার রাজধানী হিসেবে ঢাকার নগরায়ণে নতুন ধরনের গতি পায়। ইব্রাহিম খাঁর শাসনকালে বাণিজ্যিক দিক থেকে ঢাকার গুরুত্ব অন্য উচ্চতায় পৌঁছে। আরব, পারস্য, আর্মেনিয়া, চীন, মালয়া, জাভা ও সুমাত্রার সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে এই সময়েই। পিছিয়ে ছিলেন না ইউরোপীয় বণিকরাও। ১৬১৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে পর্তুগিজ, ডাচ, ইংরেজ ও ফরাসিরাও ব্যবসার প্রয়োজনে ঢাকায় আসতে থাকেন। মাঝে কয়েক বছরের জন্য ১৬৪০ সালে শাহ সুজা রাজধানী রাজমহলে ফিরিয়ে নিলেও বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে ঢাকার মহিমায় এতটুকুও ধুলো জমেনি। ১৬৬০ সালে মীর জুমলার হাত ধরে ঢাকা আবার সুবাহ-বাংলার রাজধানীর স্বীকৃতি ফিরে পায়। বলা যায়, ১৭ শতকটি ছিল ঢাকার ইতিহাসে এক স্বর্ণালি যুগ। শায়েস্তা খাঁর আমলে সব দিক দিয়েই উন্নতির শিখরে পৌঁছে যায় ১০ লাখ মানুষের শহরটি। ফরাসি পরিব্রাজক জাঁ-ব্যাপ্টিস্ট তাভার্নিয়ের ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকাকে দেখে বলেছিলেন, 'ঢাকা দারুণ শহর। শহরটির দৈর্ঘ্য প্রায় দুই লিগ।'

মুঘল আমলে ঢাকার আয়তন ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সমানতালে গড়ে উঠতে থাকে নান্দনিক সব স্থাপনা। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো লালবাগের দুর্গ, সম্রাট আওরঙ্গজেবের নামানুসারে শায়েস্তা খাঁ যার নাম দিয়েছিলেন কিল্লা আওরঙ্গবাদ। যুবরাজ মুহম্মদ আজম বাংলার সুবাহদার থাকাকালে ১৬৭৮ খ্রিস্টাব্দে এর নির্মাণকাজ শুরু করেন। নির্মাণ শেষ না করেই তাঁকে দিল্লি ফিরে যেতে হয়। এরপর শায়েস্তা খাঁ ১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ঢাকায় অবস্থান করলেও দুর্গের নির্মাণ শেষ করেননি।

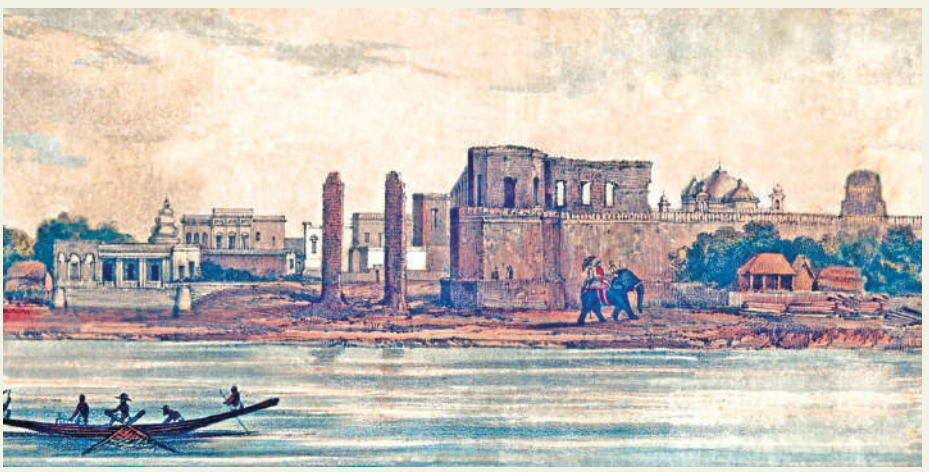

১৮ শতকের দিকে কিল্লা আওরঙ্গবাদ বা লালবাগের দুর্গের অবস্থা ■ *ছবি: প্যানারমা অব দ্য সিটি অব ঢাকা*

ঢাকার নিরাপত্তা কৌশলের অংশ

বাণিজ্যের পাশাপাশি সামরিক কৌশলগত দিক বিবেচনায়ও ঢাকার গুরুত্ব কম ছিল না। প্রাচীন বাংলার রাজধানী বিক্রমপুর ও মধ্যযুগে বাংলার রাজধানী সোনারগাঁ উভয়ের খুব সন্নিকটে ঢাকার অবস্থান। স্বাভাবিকভাবেই ওই দুই নগরীর পাশাপাশি রাজধানীর নিরাপত্তায় বাণিজ্যিক কেন্দ্র ঢাকা ক্রমে ক্যান্টনমেন্ট শহরও হয়ে উঠতে থাকে। গড়ে ওঠে বেশকিছু স্থায়ী দুর্গ। যদিও মুঘল-পূর্ব সময়েও বেশ কিছু দুর্গ ছিল, তবে সেগুলো মাটির।

ঢাকার নিরাপত্তায় নৌ-দুর্গের পাশাপাশি তিনটি প্রাসাদ দুর্গও গড়ে তোলেন মুঘল শাসকরা। এর মধ্যে যুবরাজ আজম ও শায়েস্তা খাঁ গড়ে তোলেন লালবাগ দুর্গ। জিঞ্জিরা দুর্গটি গড়ে তোলেন ইব্রাহিম খাঁ। লালবাগ দুর্গের দক্ষিণে ঢাকার পোস্তা এলাকায় আরও একটি প্রাসাদ দুর্গ নির্মাণ করেন যুবরাজ আজিম-উস-শান। এই প্রাসাদ দুর্গটি পরে বুড়িগঙ্গায় বলিন হয়ে যায়।

এসব প্রাসাদ দুর্গের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে ধরা হয় কিল্লা আওরঙ্গবাদ বা লালবাগ দুর্গকে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে দুর্গটি নির্মাণের উদ্দেশ্য কী? মুঘল শাসনামলে বাংলা সমৃদ্ধশালী প্রদেশ হওয়ার কারণেই বারবারই একে দস্যুদের আগ্রাসনের শিকার হতে হয়েছে। পর্তুগিজ ও মগ দস্যুরা শীতলক্ষ্যা নদী হয়ে ঢাকার দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা নিয়মিতই করে গেছেন। ঢাকায় পৌঁছানোর আগে সোনারগাঁ ও বিক্রমপুরেও নজর থাকত তাদের।

এই আগ্রাসন থেকে ঢাকাকে রক্ষায় চার স্তরের নিরাপত্তা কৌশল অবলম্বন করেন মুঘল শাসকরা। প্রথম স্তরটি ছিল ত্রিভুজাকৃতির প্রতিরক্ষা কৌশল। এজন্য ঢাকার বাইরে তিনটি নৌ-দুর্গ নিমাণ করা হয়। দ্বিতীয় স্তরের প্রতিরক্ষা কৌশল সাজানো হয় ফতুল্লায় দুটি দুর্গকে কেন্দ্র করে। তৃতীয় স্তরের নিরাপত্তা কৌশলের কেন্দ্রে ছিল পোস্তগোলার পোস্তকিল্লা এবং দুলাই খালের উভয় পাশে নির্মিত বেগ মুরাদ কিল্লা ১ ও ২। চতুর্থ ও সর্বশেষ কৌশলটি করা হয়েছিল ঢাকার প্রধান তিনটি দুর্গকে সামনে রেখে। এর অন্যতম হচ্ছে লালবাগ দুর্গ। পুরাতন ঢাকার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে বুড়িগঙ্গা তীরের দুর্গটি একটি প্রাসাদ দুর্গ।

বুড়িগঙ্গার তীরে যে কারণে

কিল্লা আওরঙ্গবাদ নির্মিত হয়েছিল বুড়িগঙ্গার তীর ঘেঁষে। ডয়েলির অঙ্কিত চিত্রে (১৮০৯-১১) দেখা যায়, পূর্ব-পশ্চিমে আয়তাকারে বিস্তৃত দুর্গের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের অর্ধেকেরও বেশি নদীসংলগ্ন। দুর্গে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা দেখলেও অবস্থান হিসেবে বুড়িগঙ্গার তীরকে বেছে নেওয়ার কারণ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। নদী থেকে পানি দুর্গে আনতে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের বুরুজের কাছেই তৈরি করা হয় একটি ওয়াটার হুইল বা ওয়াটার টাওয়ার। মনুষ্যচালিত ওয়াটার হুইলের সাহায্যে বুড়িগঙ্গা থেকে পানি টেনে আনা হতো দুর্গের প্রধান দুটি চ্যানেলে। একটি চ্যানেল চলে গেছে মসজিদের দিকে, আরেকটি ছাদবাগানের দিকে। দুর্গের পূর্ব দিকে ছিল বিশালাকৃতির একটি রিজার্ভার, যা ব্যালাস্ট ট্যাংক হিসেবে কাজ করত। দক্ষিণ গেটের পাশেও সম্ভবত আরেকটি ওয়াটার হুইল ছিল, যার সাহায্যে সরাসরি রিজার্ভারে পানি আনা হতো।

মুঘল আমলের এই অপূর্ব স্থাপত্যটি ছিল যুবরাজ আজম শাহের স্বপ্ন, যা পূর্ণতা পায়নি। অসম্পূর্ণ দুর্গটিই ১৮৪৪ সালে ব্রিটিশদের কাছে স্থায়ী ইজারা দেওয়া হয়। এরপর ব্রিটিশরা একে পুলিশ সদর দপ্তরে রূপান্তরিত করে। দুর্গের ভেতরেই তারা অসংখ্য ভবন নির্মাণ করে। মুঘল আমলের নকশাতেও পরিবর্তন আনা হয় এই সময়। স্বাধীনতার পর ১৯৭৪ সালে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ দুর্গটি সংরক্ষণের উদ্যোগ নেয়।

NodiBangla, a quarterly from
Bangladesh Inland Water Transport Authority

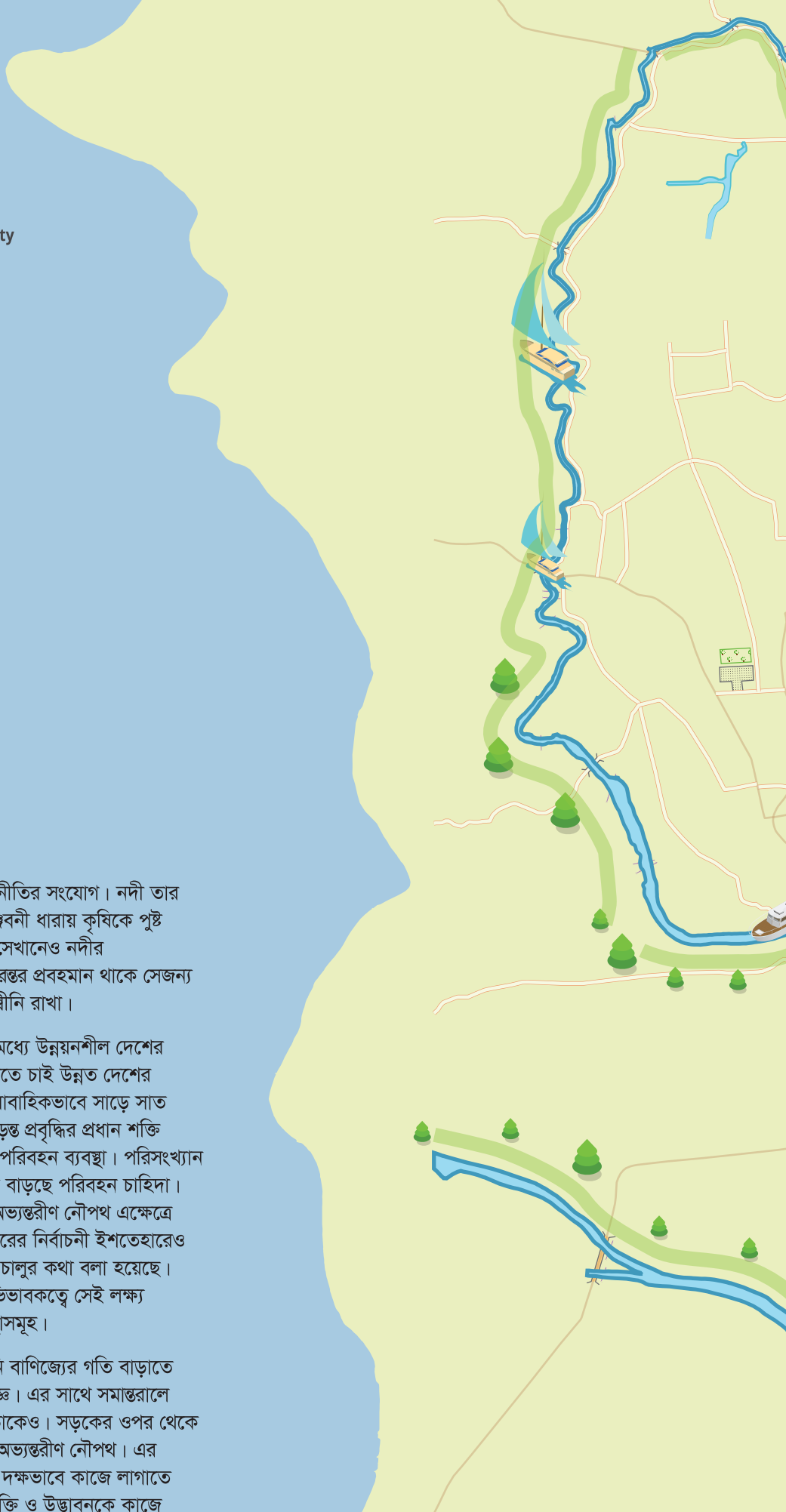

নদীবাংলা

নদ-নদীর সাথে আমাদের জীবনের যোগ; অর্থনীতির সংযোগ। নদী তার সম্পদ সুধায় আমাদের ঋদ্ধ করে। জলের সঞ্জিবনী ধারায় কৃষিকে পুষ্ট করে। শিল্পের সচলতায় যে উপযোগ দরকার সেখানেও নদীর উদার-অকৃপণ অবদান। এই অবদান যাতে নিরন্তর প্রবহমান থাকে সেজন্য সবার আগে প্রয়োজন নদীকে সুস্থ রাখা, স্রোতস্বীনি রাখা।

স্বল্পোন্নত দেশের গন্ডি পেরিয়ে আমরাও এরই মধ্যে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে অভিগমন করেছি। ২০৪১ সালেই উঠতে চাই উন্নত দেশের সোপানে। সেই লক্ষ্যে আমরা এগোচ্ছিও। ধারাবাহিকভাবে সাড়ে সাত শতাংশের উপরে প্রবৃদ্ধি অর্জন করছি। এই উড়ন্ত প্রবৃদ্ধির প্রধান শক্তি রপ্তানি-নির্ভর বাণিজ্য, যার অন্যতম শর্ত দক্ষ পরিবহন ব্যবস্থা। পরিসংখ্যান বলছে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চেয়েও বেশি হারে বাড়ছে পরিবহন চাহিদা। এজন্য চাই 'মাল্টিমোডাল' পরিবহন ব্যবস্থা। অভ্যন্তরীণ নৌপথ এক্ষেত্রে হতে পারে গুরুত্বপূর্ণ নির্ণায়ক। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারেও এই মেয়াদেই ১০ হাজার কিলোমিটার নৌপথ চালুর কথা বলা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিক-নির্দেশনা ও অভিভাবকত্বে সেই লক্ষ্য অর্জনের পথেই আছে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহ।

উন্নত বাংলাদেশের লক্ষ্য সামনে রেখে, রপ্তানি বাণিজ্যের গতি বাড়াতে শুরু হয়েছে সমুদ্র বন্দরকেন্দ্রিক ব্যাপক কর্মযজ্ঞ। এর সাথে সমান্তরালে এগিয়ে নিতে হবে অভ্যন্তরীণ পরিবহন সক্ষমতাকেও। সড়কের ওপর থেকে চাপ কমিয়ে এক্ষেত্রে ত্রাতা হয়ে উঠতে পারে অভ্যন্তরীণ নৌপথ। এর সবটাই নির্ভর করছে নৌপথকে আমরা কতটা দক্ষভাবে কাজে লাগাতে পারছি তার ওপর। এজন্য প্রয়োজন নতুন প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনকে কাজে লাগানো। অন্য দেশের অভিজ্ঞতাকে জানা।

সময় হয়েছে এখন দলবেঁধে নদীর কাছে ফেরার।